ব্রজবিদ্দহী শ্রীমদ্ভক্তশ্রী১০৮ স্বামী ধনঞ্জয়দাস কাঠিয়া বাবাজী মহারাজ
কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত স্বামী সত্যদাস নিম্বার্ক দর্শন সমিতির মুখপত্র

বাসুদেব

১৭শ বর্ষ ● ৪র্থ সংখ্যা ● বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৩

"ভূতেষু বসতে সোঽন্তর্ব্বসন্ত্যত্র চ তানি যৎ
ধাতা বিধাতা জগতাং বাসুদেবস্ততঃ প্রভুঃ ॥"

সম্পাদক—
ডক্টর অমরপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য,
এম্.এ., পি.এইচ্.ডি, বেদান্তশাস্ত্রী,
কাব্য-বেদান্তবেদান্ত-তীর্থ

যুগ্মসম্পাদক—
শ্রীসুব্রত সেনগুপ্ত এম্. এ.
শ্রীললিত কুমার বসু বি. এ.

সূচীপত্র

১। মঙ্গলাচরণ

২। সম্পাদকীয়

৩। ঈশ্বর সাধনায় প্রেমের পথ—শ্রীসুব্রত সেনগুপ্ত

৪। ভক্তি ও জ্ঞান—শ্রীনির্মলকুমার মিত্র

৫। যোগদৃষ্টি—শ্রীনলিনীকান্ত বসু

ব্রাহ্মণাদি বর্ণ কি জন্মগত অথবা গুণকর্মগত
—ডঃ অমরপ্রসাদ ভট্টাচার্য

গীতোক্ত শ্রীভগবদবতারতত্ত্ব ও বিশ্বরূপ দর্শন
—শ্রীধর্মদাস রায় ১২০

শিলচর কাঠিয়া বাবার আশ্রমে দুর্গাবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা:—
শ্রীদেবেন্দ্রকুমার পালচৌধুরী

৯। একটি স্মৃতিচারণ—শ্রীমতী আলো মুখার্জি— ১২৫

১০। বাঁশী বাজে (কবিতা)—শ্রীকিঙ্কর শ্যামানন্দ

১১। শ্রীশ্রীগীতা ও আমি (কবিতা)—
শ্রীমতী নমিতা গোস্বামী

শিলচরে শ্রীশ্রীরামদাস কাঠিয়া বাবা সংস্কৃত
মহাবিদ্যালয়

১৩। নিবার্ক জন্মোৎসব নির্ণয়

১৪। সাময়িকী

বিশেষ আবেদন

শ্রীশ্রীগুরুদেবের নির্দ্দেশে আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, শ্রীশ্রীগুরুদেবের জন্মস্থান বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত ভড়া গ্রামে একটী মহাবিদ্যালয় (Degree College) স্থাপনের জন্য গ্রামবাসীগণ সরকার বাহাদুরকে মঞ্জুরির আবেদন করিয়াছেন। বাঁকুড়া জেলার কলেজ ইনস্পেক্টর এতৎ উদ্দেশ্যে ভড়া গ্রামে আসিয়া স্থান পরিদর্শন করিয়া গিয়াছেন।

গ্রামবাসীগণ এই উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় জমি সংগ্রহ করিয়াছেন এবং কিছু অর্থও সংগ্রহ করিয়াছেন। কিন্তু এই মহৎ কার্য্যে বহু অর্থের প্রয়োজন।

গুরুভ্রাতাভগিনীগণের নিকট আবেদন, তাঁহারা যেন মুক্তহস্তে যথাসাধ্য দান করিয়া এই মহৎ উদ্দেশ্যকে জয়যুক্ত করেন।

সরকারের নির্দ্দেশ একমাসের মধ্যে অন্ততঃ আরো ১৫০০০ টাকা কলেজ বিল্ডিং তহবিলে জমা দেখাইতে হইবে ও সত্বর গৃহ-নির্ম্মাণ কার্য্য সমাধা করিতে হইবে।

অর্থ পাঠাইবার ঠিকানা :—

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু
১৩-১এ, যুগীপাড়া রোড,
কলিকাতা-৭০০০০৬

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু,
সেক্রেটারী,
কাঠিয়াবাবার আশ্রম।

বাসুদেব

বৈশাখ
১৩৬৮

মঙ্গলাচরণ

নমোঽকিঞ্চনবিত্তায় নিবৃত্তগুণবৃত্তয়ে।
আত্মারামায় শান্তায় কেবলাপতয়ে নমঃ॥

ভাগঃ ১।৮।২৭

—(হে কৃষ্ণ!) ভক্তগণই তোমার একমাত্র বিত্ত, রজঃ প্রভৃতি গুণের বৃত্তি কামলোভাদি তোমা হইতে দূরে আছে, তুমি পূর্ণানন্দস্বরূপ, শান্তমূর্ত্তি এবং মুক্তিদাতা। তোমাকে নমস্কার করিতেছি।

সম্পাদকীয়

"সদাচারে" পালনের আবশ্যকতা সম্বন্ধে অনেক আধুনিক শিক্ষিত লোকের মনে প্রশ্ন জাগে যে, 'ভগবানের নাম করব, তা অত আচার-বিচার, নিয়ম কানুনের প্রয়োজন কি?' বৃথা আচার-অনুষ্ঠানের জটিলতায় পড়ে মন শুধু পরিশ্রান্ত ও বিভ্রান্তই হয়; সময়ও নষ্ট হয় বেশী, তার চেয়ে বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠানে যে সময় নষ্ট হয়, সেই সময়ে নাম জপ করলে কাজ হয় বেশী। সুতরাং লোক দেখানো বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠানের গোড়ং ছেড়ে দিয়ে মনে মনে 'নাম জপ' ও ধ্যান প্রভৃতি করাই তো ভাল···ইত্যাদি। গীতায় ষোড়শ অধ্যায়ে তেইশ শ্লোকে ভগবান্ বলেছেন—

"যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ততে কামকারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্॥"

অর্থাৎ যে ব্যক্তি শাস্ত্রের বিধিনিষেধ ত্যাগ করে আপন ইচ্ছামত কাজ করে, সে কখনও সিদ্ধিলাভ করতে পারে না। অধ্যাত্ম সাধনপথ শাস্ত্রোপদিষ্ট পথ। ব্রহ্মজ্ঞ ঋষিগণের উপদিষ্ট শাস্ত্রবিহিত পথ ত্যাগ করে নিজের ইচ্ছায় চললে অধ্যাত্মতত্ত্বের উপলব্ধি অসম্ভব। তাই কঠোপনিষদে বলেছেন—

"ন নরেণাবরেণ প্রোক্ত এষ
সুবিজ্ঞেয়ো বহুধা চিন্ত্যমানঃ।
অনন্যপ্রোক্তে গতিরত্র নাস্তি-
অণীয়ান্ হ্যতর্ক্যমণুপ্রমাণাৎ॥"
—১।২।৮

অর্থাৎ—সাধারণ মানুষের উপদেশে আত্মজ্ঞান লাভ হয় না, কারণ আত্মা সম্বন্ধে নানাজনে নানা ভাবের কথা বলে থাকে। আত্মজ্ঞান অতি দুর্জ্ঞেয়। ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্ন বোধে প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের উপদেশেই আত্মজ্ঞান লাভ হয়। সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষদের উপদেশ মত চলতে হয়, কারণ এই আত্মতত্ত্ব সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্ম—ইহা তর্কের বিষয় নহে।

এই অতি দুর্জ্ঞেয় আত্মতত্ত্বকে জানতে হলে তার জন্যে প্রস্তুতির প্রয়োজন। আর 'সদাচার' বা শাস্ত্রবিহিত কর্ত্তব্য কর্মাদির অনুষ্ঠান করাই হল এই প্রস্তুতির ভূমিকা। সদাচার পালন সমস্ত প্রকার ধর্মলাভের মূল। 'সদাচার' পালন না করলে শরীর, মন ও বুদ্ধি শুদ্ধ হয় না। আজকাল অনেকে শাস্ত্রচর্চ্চা করেন বটে, কিন্তু যথোচিত 'সদাচার' পালন করেন না.—ফলে আত্মোপলব্ধিও তাঁদের হয় না। তাই শাস্ত্রে বলেছেন—

"শাস্ত্রাণ্যধীত্যাপি ভবন্তি মূর্খা।
যস্তু ক্রিয়াবান্ পুরুষঃ স এব।"
"আচারহীনং ন পুনন্তি বেদা যদ্যপ্যধীতা
সহষড়ভিরঙ্গৈঃ।
ছন্দাংস্যেনং মৃত্যুকালে ত্যজন্তি নীড়ং
শকুন্তা ইব জাতপক্ষা।"

অর্থাৎ, যিনি শাস্ত্রসমূহ অধ্যয়ন করেও শাস্ত্রবিহিত সদাচারাদি কর্ত্তব্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন না, তাঁকে মূর্খই বলতে হবে। যিনি ক্রিয়াশীল বা আচারপরায়ণ, তিনিই যথার্থ পুরুষ। ষড়ঙ্গের সঙ্গে বেদ অধ্যয়ন করলেও আচার-হীন পুরুষকে বেদ পবিত্র করে না। ডানা বের হলে পাখী যেমন তার বাসা ত্যাগ করে উড়ে যায়, তেমনি বেদও মৃত্যুর সময়ে সেই আচারহীন পুরুষকে ত্যাগ করে যায়।

বাস্তবিক সদাচারই সমস্ত ধর্ম্মের মূল। মনুসংহিতায় 'বেদঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ" (২।১২)—এই উক্তিতে সদাচারকেও ধর্ম লাভের অন্যতম মূল বলা হয়েছে। মনুসংহিতায় অন্যত্রও সদাচারকে পরম ধর্ম বলা হয়েছে। যথা—"আচারঃ পরমো ধর্মঃ" (১।১০৮)। সদাচারই যে ধর্ম লাভের মূল—এ কথা মহাভারতেও বলা হয়েছে—"আচারঃ প্রভবো ধর্মঃ (মহাভারত—অনু ১০৪।১৪৭)। ভবিষ্যপুরাণেও সদাচারকে ধর্ম লাভের মূল বলা হয়েছে :—

"আচার এব ধর্মস্য মূলং ব্রাহ্মন্ কুলস্য চ।
আচারাদ্বিচ্যুতো ব্রহ্মন্ ন ফলীলো ন বাদ্ধিকঃ।"

—আচারই ধর্মলাভের মূল। আচার হইতে বিচ্যুত মনুষ্য নববাগুণসম্পন্ন কুলীন বা ধার্মিক হতে পারে না,—সদাচার হতে বিচ্যুত হলে মনুষ্য তখন 'জন্তু' বা পশুর সমান হয়।

সুতরাং ধর্মলাভার্থী অধ্যাত্মপথের সাধকের পক্ষে সদাচার পালন সাধনার অপরিহার্য্য অঙ্গ। এই সদাচার বলতে "সাধুগণের আচরণ"কেই বুঝায়। এই সম্বন্ধে বিষ্ণুপুরাণে বলা হয়েছে—

যে সমস্ত মহাত্মার আচরণ সর্ব্বপ্রকার দোষ রহিত, তাঁরাই সাধু। 'সৎ' শব্দ সাধুশব্দ বাচক। সাধুদিগের আচারকেই সদাচার বলে। আচারই ধর্ম্মের মূল। শাস্ত্র-বিহিত সদাচারই সাধুত্বের লক্ষণ।

সুতরাং যিনি শাস্ত্রজ্ঞ বা সুপণ্ডিত না হয়েও শাস্ত্রের কথা অল্প মাত্র শ্রবণ করে তদনুসারে কর্ম্মানুষ্ঠান করেন, সেই ক্রিয়াবান্ সদাচারযুক্ত পুরুষই সাধু। পরিষ্কৃত বস্ত্র পরিধান করলে যেমন কোন অপবিত্র বা মলিনতাপূর্ণ স্থানে বসবার ইচ্ছা হয় না, সেইরূপ সদাচার পরায়ণ হলে পাপাচরণ বা নিষিদ্ধ কর্ম্ম হতে বিরত থাকবার এবং সব সময় সৎকর্ম্মে নিযুক্ত থাকবার ইচ্ছাই জাগে। যদি একটিমাত্রও সদাচার কেউ প্রাণপণে পালন করে, তাহলে অন্য সব সদাচার বা ধর্ম্মও আপনা আপনি তার চরিত্রে ফুটে উঠবে।

প্রত্যহ ত্রিসন্ধ্যা স্নান, শৌচ, তিলকধারণ, সন্ধ্যা, পূজা, জপ, ধ্যান, স্বাধ্যায় বা গীতা প্রভৃতি শাস্ত্র পাঠ, প্রণাম স্তবন, আরতি দর্শন, একাদশী ব্রতের অনুষ্ঠান, শাস্ত্রোক্ত নানাবিধ ব্রত ও উপবাস, শ্রীভগবান্নাম কীর্ত্তন, সাত্ত্বিক আহার, নিষিদ্ধ কার্য্য পরিত্যাগ প্রভৃতি শাস্ত্রবিহিত ভক্তিপ্রাপক সাধুগণের অনুষ্ঠানই সদাচার। জন্ম, শাস্ত্রজ্ঞান ও কুল সাধুত্বের কারণ নয়, সদাচারই সাধুত্বের কারণ। সদাচার পালনের ফলে শরীর, মন, ও বুদ্ধি নির্ম্মল হয় ও আত্মদর্শনের যোগ্যতা লাভ হয়। পাতঞ্জল দর্শনে বলা হয়েছে—"শৌচাৎ স্বাঙ্গজুগুপ্সা পরৈরসংসর্গঃ। সত্ত্বশুদ্ধিসৌমনস্যৈকাগ্র্যেন্দ্রিয়জয়াত্মদর্শনযোগ্যত্বানি চ।" অর্থাৎ শৌচ থেকে নিজের শরীরের প্রতি ঘৃণাজ্ঞান ও ঘৃণা জন্মে। তখন আর জলবুদ্বুদ তুল্য মরণধর্ম্মী ও মলমূত্রাদিময় এই শরীরের প্রতি কোন প্রকার আস্থা বা আদর থাকে না এবং শরীরের সংসর্গেই ইচ্ছাও নিবৃত্ত হয়।

শৌচ—বাহ্য ও আভ্যন্তর ভেদে দুইপ্রকার। জল, মৃত্তিকা প্রভৃতির দ্বারা শরীরকে পরিষ্কৃত ও নির্ম্মল করাকে বলে বাহ্য শৌচ, আর ভাবশুদ্ধির ফলে চিত্তের শুদ্ধিই আভ্যন্তর শৌচ। এই আভ্যন্তর শৌচের ফলে সত্ত্বশুদ্ধি হয়, ক্রমে সৌমনস্য অর্থাৎ মনের প্রসন্নতা, একাগ্রতা, ইন্দ্রিয় জয় ও আত্মদর্শনের যোগ্যতাও এই আভ্যন্তরিক শৌচের ফলে লাভ হয়। একমাত্র 'শৌচ' থেকেই এই সমস্ত মহান লাভ হয়। সুতরাং এই শৌচ ও সদাচারের মহিমার তুলনা নেই। এই শৌচ ও সদাচার থেকে বিচ্যুত হয়ে যে অনাচারী ও দুষ্কৃতিপরায়ণ হয় তার পক্ষে আত্মজ্ঞান লাভ সম্পূর্ণ অসম্ভবই হয়। তাই ঋষি কঠোপনিষদে বললেন—

"নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ।
নাশান্তমানসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ।"

— কঠ ১।২।২৪

অর্থাৎ, যে লোক দুশ্চরিত্র বা অসদাচরণ থেকে বিরত হয়নি, যার মন শান্ত ও সমাহিত হয়নি, সেই অশান্তমনা দুষ্কৃতিপরায়ণ ব্যক্তি জ্ঞানের দ্বারা এই আত্মাকে লাভ করতে পারে না।

তাই শেষে আবার বলছি এই সদাচারই ধর্ম্মলাভের উপায়, আত্মদর্শনের যোগ্যতা এই সদাচার অভ্যাসের ফলেই ধীরে ধীরে লাভ হয়। শাস্ত্রবিহিত সদাচার ও কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান ত্যাগ করে কেবলমাত্র জ্ঞানের দ্বারা আত্মোপলব্ধি কখনই হয় না।

তাই মহামুনি জাবিত বললেন—

"দ্বাভ্যামেব হি পক্ষাভ্যাং যথা বৈ পক্ষিণাং গতিঃ।
তথৈব জ্ঞানকর্ম্মাভ্যাং প্রাপ্যতে ব্রহ্ম শাশ্বতম্।"

—দুইটি পক্ষের সাহায্যেই যেমন পক্ষিগণ আকাশে উড়তে পারে, সেইরূপ জ্ঞান ও কর্ম্মানুষ্ঠান—এই উভয়ের দ্বারাই সেই ব্রহ্মকে লাভ করতে হবে।

সুতরাং শাস্ত্রবিহিত সদাচার ও নিয়মমতারে কর্ম্মানুষ্ঠান সাধকের অবশ্যই করতে হবে, এর কোনমতেই বাদ দেওয়া চলে না।

ঈশ্বর সাধনায় প্রেমের পথ

শ্রীসুব্রত সেনগুপ্ত এম. এ

ভগবান সাকার না নিরাকার এ নিয়ে যুগে যুগে কত কথাই না হয়েছে! কবীর এ দ্বন্দ্বের অবসান করবার প্রচেষ্টায় বললেন—

সাকার মেরা বাপ, নিরাকার মর্‌ মাঈ
কা'কো নিন্দ্যো, কা'কে বন্দ্যো,
দোনো পাল্লা ভারী!

আবার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, ভগবান নিরাকার বটেন আবার সাধকের ভক্তি চিত্তে জন্মে তিনি সাকারও হয়েছেন। তাঁকে যে ভাবেই চিন্তা করুন না কেন, এ কথা ঠিকই যে নিরাকারে তিনি সহজগ্রাহ্য, সহজলভ্য মন বলে মানুষ সাধারণতঃ সাকারেই তাঁকে আরাধনা করেছেন, করতে চেয়েছেন। সাকারেই যে তিনি যেন ধরাছোঁয়ার মধ্যে এসে যান—সাধকজনের চিত্তার্থায় স্বপ্নলোক রূপকল্পনা। এই যে তাঁকে সাকারে আরাধনা—এতেও আবার দেখা গেল মানুষ তাঁকে ধরতে চেয়েছেন, পূজা করছেন, ভক্তি করছেন, ভালবেসেছেন, মানুষেরই রূপে। কারণ মানুষ আমরা, ভগবানকে মানুষ রূপে দেখতে চেষ্টা করার থেকে আর সহজতর পন্থা কি আছে? নিরাকার থেকে সাধক তাঁকে টেনে এনেছেন সাকারে এবং তা হতেও আবার মানুষরূপে।

শেষ এখানেই নয়: মানুষরূপেও আবার তাতে আরোপ করা হয়েছে পুরুষ ও স্ত্রী দেহ। যেমন কেউ তাঁকে আরাধনা করেন বিষ্ণু, শিব, গনেশাদি রূপে, কেউ বা তাঁকে কালী, তারা, সরস্বতীরূপে পূজা করেন। বৈষ্ণবদের মধ্যে শ্রীরাধা-কৃষ্ণের উপাসনা করা আবার আরো এগিয়েছেন—পরম-পুরুষ ও পরমা প্রকৃতিকে নিয়ে এসেছেন বৃন্দাবনে, যমুনা পুলিনে, কুঞ্জে কুঞ্জে, কৃষ্ণ ও কৃষ্ণপ্রিয়া—শ্রীরাধাকৃষ্ণযুগলের রূপে। তাঁদের দিয়ে ঠিক মানুষী লীলা করিয়েছেন—অনুরাগ কলহ ইত্যাদি করিয়েছেন অর্থাৎ মানুষ প্রিয় ও তাঁর মানুষী প্রিয়া রূপে। শ্রীবৃন্দাবনে তাই এই প্রেমঘন যুগলমূর্তিকে বড় মধুর ভাবে উল্লেখ করা হয় 'প্রিয়াজী' ও 'প্রীতমজী' বলে। বৈষ্ণব পরম সাধক পদকর্তারাও "মানুষী-তনুমাশ্রিতম্" শ্রীভগবানকে তাঁর শক্তির সঙ্গে একেবারেই নারীপুরুষের লীলা করিয়ে পদাবলীতে বিভিন্ন ভাবের অবতারণা করেছেন—বিপ্রলব্ধা, খণ্ডিতা, মাথুর, বাসক-সজ্জা ভাবসম্মিলন ইত্যাদি। প্রিয়তম তাঁর অন্তরতম প্রিয়ার সঙ্গে বৃন্দাবনে অপার্থিব অথচ পার্থিব লীলা করেছেন—কখনও কেলিকুঞ্জে বিহার করেছেন, তার পূর্বে হয় ত সঙ্কেতবটে বাঁশীর সুরে সুদূর বর্ষাণার বৃষভানুকুমারীকে সঙ্কেত করেছেন মিলনানন্দে সম্মিলিত হতে, কখনও বা কপট রাগ করে প্রিয়ার কাছ থেকে দূরে সরে গিয়ে তাঁকে অভি-বিরহা করেছেন, কখনও বা হয় ত আবার নিশিপ্রভাতে কুঞ্জবনে এসে যখন ভিয়ানের শুনেছেন "কার কুঞ্জে নিশি পোহায়েছ বল, প্রভাতে জাগাতে এসেছ হে, তখন কৃষ্ণপ্রিয়ার রাতুল পদযুগল (বৈষ্ণব পদকর্তা আবার ঐ "চম্পকবরণী"র কোমল পা দুটিকে আলতায় রেখাঙ্কিতও করেছেন!) বুকে ধারণ করে বলেছেন—দেহি পদপল্লবমুদারম্।

এখানে এই ভাবের সঙ্গে অপর একটি বিষয়ের মনোরম সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। শুধু বৈষ্ণব পদকর্তারা নন যুগে যুগে পৃথিবীর সর্বত্র কবিরা যে পার্থিব প্রিয়-প্রিয়তমার প্রেমলীলা বর্ণনা করেছেন যাতে আছে রাগ-অনুরাগ, অভিমান, ব্যাকুলতা, বিরহ ইত্যাদি সবই স্তরস্তরভাবে—সেই সব কবিতা, সেই সব পদ বস্তুতঃ মানুষের রূপে এই ধরিত্রীর মাটিতে নিয়ে আসা পরম পুরুষ ও পরমা প্রকৃতির লীলা প্রসঙ্গেও সুন্দর-ভাবে আরোপ করা যায়। কারণ এক বিশিষ্ট দৃষ্টিতে দেখতে গেলে কৃষ্ণপ্রিয়া শ্রীরাধা আমাদের দেহমধ্যস্থ জীবাত্মা—প্রিয়কে পাবার জন্য প্রিয়ার যে ব্যাকুলতা, যে আর্তি, না পাবার যে হতাশা—এ সবই যেন পরমাত্মাকে

পাবার জন্য জীবাত্মার ব্যাকুল ক্রন্দন, না পাবার দীর্ঘশ্বাস, পাবার জন্য বারবার প্রচেষ্টা। ভারতীয় সকল প্রকার সাধনার গোড়ার কথা একটিই—উজান বেয়ে যাওয়া অর্থাৎ যাঁর কাছ থেকে এসেছি, তাঁরই কাছে ফিরে যাওয়া, তাঁতেই লীন হয়ে যাওয়া। সেই জন্যই গীতায় শ্রীভগবান সাধকের সাধনার (বলা যায় জীবাত্মার সাধনার) শেষ অবস্থা বর্ণনা করলেন "ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্"—ভক্তির বা প্রেমের দ্বারা তাঁকে জেনে, তাঁর তত্ত্ব জেনে, তাতেই প্রবেশ করাই এই শেষ অবস্থা। জীবাত্মার অহরহঃ তাই ব্যাকুলতা জন্মজন্মান্তরের সব বাধা ছিন্ন করে, সেই পরমাত্মার কাছেই ফিরে যাওয়া, তাঁকে পাওয়া, তাঁতে লীন হয়ে যাওয়া। এটি যতক্ষণ না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত থাকে বিরহ, থাকে অভিমান, থাকে অশ্রুজল।

কয়েকদিন পূর্ব্বে উর্দ্দুভাষাবিদ্ কবি গালিবের কয়েকটি পদে মিলনের জন্য, পাবার জন্য এই ব্যাকুলতা, ঈপ্সিতকে না পাওয়ার হতাশা ইত্যাদি ভাবের উল্লেখ দেখে পাঠকবর্গের কাছে সেই দুএকটি পদের উপস্থাপনা করছি। বাংলা যাঁর মাতৃভাষা এমন পাঠকের কাছে হয় ত উর্দ্দু আদৃত হবে না কিন্তু তবুও তার উল্লেখ করছি এই জন্য যে পদের বিষয়বস্তুকে যদি একটি বিশেষ দৃষ্টিতে দেখা যায়, তবে তাতে পরমাত্মার জন্য জীবাত্মার অধীর আকাঙ্ক্ষা, না পাবার হতাশা ইত্যাদির ছোঁয়া আছে, এমন হয়ত মনে করা যেতে পারে মরমী কবি যখন দেহের আকর্ষণের উর্দ্ধে উঠে প্রেমকে এক ইন্দ্রিয়াতীত অনুভূতিতে পর্য্যবসিত করেন, তখন তাতে মরমী সাধকের অন্তরেরও প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়, কারণ প্রেম সেখানে 'নিকষিত হেম, কামগন্ধ নাহি তায়'। এক পদে কবি গালিব বলছেন—

ম্যায় অওর সদহজার নবা-এ ফিগর খরাশ।
তু অওর এক দোহ না—শুনদিন, কেহ্ য়া কঁহ।

—'কি বলব, এদিকে (আমার অন্তর থেকে উত্থিত হচ্ছে) শতসহস্র আর্ত্তনাদ আর ওদিকে তুমি এক অতি আশ্চর্য্য অশ্রবণ অর্থাৎ না শোনা হয়ে রয়েছে'। এই পদের মধ্যে পরমাত্মাকে পাবার জন্য জীবাত্মার আর্ত্তনাদ শুধু নয়, অর্থাৎ মন যে ইষ্টের জন্য শতসহস্র প্রচেষ্টা করেও তাঁর দরশ-পরশ পাচ্ছে না, শুধু এই তাঁর বিলাপ নয়, আত্যন্তিক অভিমানও প্রকাশ পাচ্ছে—তুমি কি বধির হয়েছ, আমার ডাক যে শোন না? এখানে স্মরণ করা যেতে পারে এক শক্তি সাধকের প্রায় অনুরূপ পদ—মা বলে আর ডাকিব না রে ভাই, থাকলে পরে সাড়া দিত, সর্ব্বনাশী বেঁচে নাই?

গালিব আর এক জায়গায় বলছেন—

নহি গর সহ ও বর্গ-এ অদবাক এ মানে
তমান্না এ নৈরঙ্গে দুরৎ মলায়ৎ।

'তোমার বুঝবার, তোমার প্রকৃত অর্থ বুঝবার ক্ষমতা যদি কোনও দিন না'ও হয়, তবু চাই তোমার রূপের বর্ণ বৈচিত্র্য দেখার শক্তিটুকু বেঁচে থাক'। এই পদটি এই ভাবে চিন্তা করা যেতে পারে—জীবাত্মা ত সর্ব্বদাই পরমাত্মার সাথে মিলন পিয়াসী কিন্তু তিনি ত সহজে ধরা দেন না? তাই ত বাউল তাঁকে বলে 'অধরা', খঞ্জনীর সাথে এক তারার ঝঙ্কার তুলে গান ধরে "খাঁচার ভিতর অচিন পাখী কমনে আসে যায় রে, কমনে আসে যায়"! শ্রুতিও বলছেন "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ"—মন তাঁকে ধরতে পারে না বলে বাক্যও তাঁর কাছে থেকে ফিরে আসে, প্রকাশ করতে পারে না তাঁকে। তবে উপায়? উপায় এই যে, যতক্ষণ তাঁকে দেখতে না পাবি, ধরতে না পারি, ততক্ষণ এই পৃথিবীর বুকে কলে জলে ছন্দে ছড়িয়ে পড়া অবস্থাতেই তাঁকে অনুধাবন করি না কেন? তিনি গুহাহিতং; যতক্ষণ হৃদয় গুহায় প্রবেশ করে তাঁকে ধরতে না পারি, "অনাত্মনস্তু কলিলস্য মধ্যে বিশ্বস্য স্রষ্টারং অনেকরূপম্" —এই ভাবেই তাঁকে দেখি না কেন? "যিনি অগ্নিতে যিনি জলেতে, যিনি ওষধি এ ক্ষিতি তলেতে" সেখানেও ত তাঁকে দেখতে পাওয়া যাবে তাঁর আর রূপে—এ দুই সেই ত আনাগোনা; তাই তাঁর পেতে চায় রূপের মাঝারে অরূপ, রূপ হতে চায় ভাবের মাঝারে হারা। তোমায় বুঝতে পারি, ধরতে পারি না, তাই এই বিশাল প্রকৃতির রূপে রসে গন্ধে বর্ণে তোমার রূপ দেখি।

যখন মিলন, তখনই পাবার প্রচেষ্টার পরিসমাপ্তি। কিন্তু যতক্ষণ সেই পরম প্রাপ্তি হয় না, ততক্ষণ শুধু তাঁর জন্য অপেক্ষা, জীবাত্মার যেন শবরীর প্রতীক্ষা। কবি গালিব বললেন—

হুঁ নহি থি কি হমারে কিসমৎ কেহ বিসাল-এ য়ার হোতা।
অগর অওর জী'তে রহতে, য়হি ইন্তজার হোতা।

—আমার ভাগ্যে নেই যে তোমার সাথে আমার মিলন হবে। (তাই মনে হয়) যদি আরও বাঁচতাম (তবুও পাওয়া আমার হত না), এই প্রতীক্ষাই চলত। সাধনের ক্ষেত্রে এই প্রতীক্ষাই ত চলতে থাকে জন্মজন্মান্তরে, যতক্ষণ পর্যন্ত ঈপ্সিত এসে ধরা না দেন? চাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পাওয়া ক'জনের ভাগ্যে ঘটে? সেখানে "মনুষ্যানাং সহস্রেষু কশ্চিৎ যততি সিদ্ধয়ে" সেখানে "বাসুদেবঃ সর্বমিতি" হওয়া ও "বহূনাং জন্মনামন্তে"-ই হয়? অন্যত্র দেখি অপর এক সাধক সদকর্তা গাইছেন "জানা মা উড়াচ্ছে ঘুড়ি; ঘুড়ি লক্ষের একটা ভোঁ কাটে, বলে হাও মা হাও চাপড়ি!" লক্ষের একটি ভুটিই যদি আপকাম, অন্যের অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় কি?

শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন "মানুষের অভীপ্সা লেলীহান হয়ে উঠছে দ্যুলোকের পানে, কিন্তু এই অভীপ্সার সবসময় পূর্ণতা পাওয়া দুর্ঘট, কারণ পরম প্রিয়কে চাওয়ার অন্তরায় হচ্ছে নিত্য নব কামনা, উপভোগে যার নেই প্রশান্তি, হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব যা কেবল বেড়েই চলেছে। যিনি বাসনার স্বরূপ বুঝতে পেরেছেন, তিনিই গভীর হতাশায় বলতে পারেন যে শুধুমাত্র বাসনার পরিসমাপ্তির পরেই যে আসবে পূর্ণতা, আমি তা জানি। কিন্তু এও বুঝি যে কামনার পরিসমাপ্তি যে কোনও দিন হবে সেটা ত অবান্তর প্রশ্ন; হবে না'ই যে ধরে নিয়েছি। তাই গালিবের পদেও পাই এই খেদোক্তি—

হুঁ ম্যায় ভি তমাশাই—এ নৈরঙ্গে তমন্না
মতলব নহি কুছ ইস সে, কেহ মতলব হি বর আয়ে।

—বাসনার নিত্য নানা রঙে রঙীন হয়ে ওঠারই (দুর্ভাগ্য) দর্শক আমি। কিন্তু (সব কিছুকে অতিক্রম করে) আমার বাসনা কোনও দিন পূর্ণ হবে কি না এই প্রশ্ন ত অবান্তর!

বহু জন্মের সুকৃতির ফলে এই দুর্লভ মানবজন্ম পাওয়া যায়, একথা ত সর্বজনস্বীকৃত। কিন্তু মানবজন্ম পেয়েও তাঁকে পাবার জন্য ক'জন প্রচেষ্টা করেন, কারণ জীবাত্মা যে সেখানে মহামায়ার মোহ পাশে আবদ্ধ হয়ে নিজের স্বরূপ ভুলে গেছে? তাই বৈষ্ণব পদকর্তার খেদোক্তি দেখি—

তাতল সৈকতে বারি বিন্দুসম, সুতমিত রমণী সমাজে।
তোহে বিসরি মন তাহে সমর্পিনু, অব মুঝু হব কোন কাজে—
মাধব, হাম পরিণাম নিরাশা!

আবার চেষ্টা করলেই কি তাঁকে পাওয়া যায়? সুদূর সাধনায় জীবন কেটে গেল অথচ পরমাত্মাকে পেলাম না, এই ত হয় (যার উল্লেখ পূর্বেই করা হয়েছে)। কেন এরকম হয় তার উত্তর ও শ্রুতিই দিয়েছেন—"যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ"—এই আত্মা যারা যাকে বরণ করেন একমাত্র তার দ্বারাই লভ্য হ'ন, তারই কাছে নিজের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করেন। কাজেই যার সময় হয় নি, জীবাত্মা যেখানে তার পরমপ্রিয়কে পাবার অধিকার তখনও অর্জন করতে পারে নি, সেখানে না পাওয়া অবস্থাতেই ত চলে যেতে হবে পৃথিবীর বুক থেকে, আবার পরিভ্রমণ করতে হবে জন্মজন্মান্তরের আবর্তনে। ইষ্টকে ভালবেসে, তাঁকে চেয়েও না পেয়ে চলে যাবার হতাশা প্রতিধ্বনিত হয়েছে গালিবের পদে এ কথাও বলা যায়—

যাতা হুঁ হাশ এ হসরৎ হসৃতি লিয়ে হুয়ে
হুঁ শমা-এ-কুশতহ্ দরখুর এ মহ্‌ফিল নহি রহা

—জীবনের অপূর্ণ বাসনার ক্ষতচিহ্ন অঙ্গে নিয়ে আমি চলে যাচ্ছি (এ ধরিত্রীর অঙ্গন থেকে)। আমি এক নির্বাপিত দীপ যে আর সভায় আলো বিকিরণ করবার যোগ্য নয়।

নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ ঈশ্বরকে মানুষ যুগে যুগে এই ভাবেই মানুষরূপে নামিয়ে এনেছে ধরার প্রাঙ্গনে। তাঁকে পাবার পথ অনন্ত; যে যেপথেই চলুক, উদ্দেশ্য এক, লক্ষ্য একই। এই সাধনায় যার ভাব যাই হ'ক না কেন, যদি তাতে থাকে নিষ্ঠা, আন্তরিকতা, অনন্য চিত্তে তাঁরই শরণাগত হওয়া, সিদ্ধি সেখানে অতি সহজেই এসেছে, কারণ, কে ক'বার ফটা বাজাল, বা কে কতটা তাঁকে

ভোগ নিবেদন করল কি দিয়ে—সে সবই ত বাহ্য—অন্তরের ভাবই ত আসল। তাই না হলে ঠাকুরের অনন্ত নামের মধ্যে একটি হ'ল, ভাবগ্রাহী জনার্দন! তাঁর সাধনার প্রেমের পথও একটি অতি আদৃত পথ—এ পথে যাঁরা গেছেন, তাঁরাই জানেন এ পথ কত কোমল, কত মধুর কারণ "মধুরাদি-পতেরখিলং মধুরং!" এই প্রেমের সাধনার পথে রয়েছে মান, অভিমান, অনুরাগ, বিরহ ইত্যাদি মনের কোমল বৃত্তিগুলির প্রকাশ, যে প্রকাশ আমরা পার্থিব প্রেমের প্রকাশেও দেখি। তাই মরমী কবি যে ভাষায় কথা বলেন, মরমী সাধকের ভাষাও যেন তাই; পন্থা শুধু হল প্রেমের প্রকৃতির মোড় ফিরিয়ে দেওয়া, ইন্দ্রিয়াসক্তির স্তর থেকে অতীন্দ্রিয়ের পর্য্যায়ে নিয়ে যাওয়া। গালিবের কয়েকটি পদের মাধ্যমে তাই ইঙ্গিত দেবার প্রচেষ্টা করেছি এই নিবন্ধে।

ভক্তি ও জ্ঞান

শ্রীনির্ম্মল কুমার মিত্র

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

মুক্তি সম্বন্ধে তাঁহার মতিলালের সর্ব্বশেষ আস্বাদ দেওয়া যাইতেছে—

"ন মুক্তি র্জপনাদ্ধোমাদুপবাসশতৈরপি।
ব্রহ্মৈবাহমিতি জ্ঞাত্বা মুক্তো ভবতি দেবতং॥
আত্মজ্ঞানমিদং দেবি পরং মোক্ষৈক সাধনম্।
জ্ঞানন্নিহৈব মুক্তঃ স্যাৎ সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ"

পীঠমালাতন্ত্র

শত শত জপ, হোম, উপবাস-দ্বারা মুক্তিলাভ হয় না, মনুষ্য নিজেকে অখণ্ডচৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্ম জানিয়া মুক্ত হয় আত্মজ্ঞান মোক্ষলাভের একমাত্র শ্রেষ্ঠ সাধন। নিজেকে ব্রহ্মস্বরূপ জানিয়া মনুষ্য এই দেহে থাকিয়াই মুক্ত হয়। ইহা ত্রিকাল সত্য, ইহাতে কোন সংশয় নাই।

পরমানন্দস্বরূপে অবস্থিতি ভিন্ন জীবের সর্ব্বদুঃখ নিবৃত্তি হইবে না। এই সর্ব্বদুঃখ-নিবৃত্তি বা পরমানন্দে নিত্যস্থিতির নামই জীবন্মুক্তি বা বিদেহমুক্তি। যোগ (কর্ম্ম), ভক্তি ও জ্ঞানরূপ উপায় দ্বারা ক্রমে ক্রমে জীব কৈবল্যমুক্তি লাভ করিতে পারে। এইজন্য এই সমস্ত সাধন ক্রম-অনুসারে আবশ্যক।

ভক্তগণ যাঁহাকে "স্বয়ং" বলেন সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় যখন জ্ঞানের মহিমা মুক্তকণ্ঠে ৪।৩৪-৩৯ (৭টী শ্লোকে) প্রকাশ করিতেছেন, তখন তাঁহার ভক্ত জ্ঞানের নিন্দা কিরূপে করিতে পারেন? সুতরাং জ্ঞান কিছুই নহে, জ্ঞান তুচ্ছ—এরূপ বিচার করা যুক্তিসঙ্গত নহে।

গীতাধ্যানে উক্ত হইয়াছে "অদ্বৈতামৃতবর্ষিণীং ভগবতীম-ষ্টাদশাধ্যায়িনীম্ ত্বা-মনুসংদধামি ভগবদ্গীতে। ভব-দ্বেষিণীম্।" ইহাতে প্রমাণিত হইতেছে, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা অদ্বৈতময় গ্রন্থ, কেবল দ্বৈতময় নহে।

মায়ার আশ্রয়েই সগুণব্রহ্ম, জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তিতে খেলা করেন। তুরীয়পাদে কোন খেলা নাই। ব্রহ্মের শক্তিকে অন্তরঙ্গা বহিরঙ্গা যে ভাবেই দেখ, তথাপি বলিতে হইবে, যেখানে খেলা, যেখানে লীলা, যেখানে চলন, তাহাই মায়িক ব্যাপার। শক্তির অব্যক্ত অবস্থাতে ইহা কি, কেহই জানে না। যেখানে চলন, সেখানেই শক্তির ব্যক্তাবস্থা। কাজেই লীলা যেখানে সেখানেই ব্যক্তাবস্থা, সেখানেই মায়া। মায়া ভিন্ন দেহধারণই হয় না। এই কারণে (মহাভারতে) "মোক্ষধর্ম্মে" শ্রীভগবান্ নারদকে বলিয়াছেন—"মায়া হ্যেষা ময়া সৃষ্টা যন্মাং পশ্যসি নারদ। সর্ব্বভূতগুণৈর্যুক্তং ন তু মাং জ্ঞাতুমর্হসি।" কাজেই মায়া

ভিন্ন কোন লীলা হয় না। মায়ার যে শুদ্ধসত্ত্বাবস্থা, সেইখানকার লীলাই ঈশ্বরলীলা। সত্ত্বগুণ মায়ার প্রধান গুণ। ইহা মায়াতীত নহে। শুদ্ধসত্ত্ব যাহা তাহা দ্বারা ঈশ্বরের মূর্ত্তি রচিত হয়। শুদ্ধসত্ত্বের লীলা সর্ব্বদা ব্রহ্মমুখে প্রবর্ত্তিত বলিয়া ঈশ্বরলীলাচিন্তায় চিত্তশুদ্ধি হয়। চিত্তশুদ্ধির পরে যখন চিত্ত ব্রহ্মভাবে ভাবিত হয়, তখনই আনন্দে স্থিতি।

তাই বলা হইয়াছে—মায়া যা অবিদ্যাধীন যিনি, তিনি বদ্ধ জীব, আর মায়াধীশ যিনি, তিনিই ঈশ্বর, তিনিই অন্তর্যামী। এই ঈশ্বরই সকলের অন্তরে থাকিয়া সকলের প্রেরক। এই ঈশ্বরই বদ্ধজীবের উপাস্য। ইনিই খণ্ডকে অখণ্ডে মিশাইয়া (জীবের) মুক্তি দিয়া থাকেন। কোন উপাসনায় ইনি বহুবীর দুর্গা কোন উপাসনায় ইনিই দুর্গা, শিব, রাম, কৃষ্ণ, কালী, তারা ইত্যাদি দেব-দেবী মূর্ত্তি।

আমরা গীতাতে পাই, অর্জ্জুন শ্রীভগবানের কৃপা শক্তিতে "বিশ্বরূপ" দর্শন করিলেন এবং ভক্তিযোগের কথাও শ্রবণ করিলেন। ইহার পরই জ্ঞানযোগ আরম্ভ হইল। শ্রীভগবান্ বলিলেন—এই শরীরটাই ক্ষেত্র, আমি ক্ষেত্রজ্ঞ। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ এই উভয়ের যে জ্ঞান তাহাই "জ্ঞান"—"ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং যৎ তজ্জ্ঞানং মতং মম।" (১৩।২) এই জ্ঞান লাভের উপায় বিংশতি প্রকার। এই বিংশতি প্রকার উপায়ের মধ্যে "ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী।" (১৩।১০) তাহাতে অনন্যযোগপূর্ব্বক অব্যভিচারিণী ভক্তিকে শ্রীভগবান্ জ্ঞানের সাধন বলিলেন। জ্ঞানলাভের জন্যই ভক্তি আবশ্যক শ্রীগীতা ইহাই প্রতিপন্ন করিতেছেন। শ্রীভগবান আত্মজ্ঞান-নিরূপণ তত্ত্বজ্ঞানালোচনাকেও জ্ঞানের সাধনা বলিয়াছেন—"তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্"। জ্ঞানের সাধনা বলিবার পর জ্ঞানস্বরূপ জ্ঞেয় বস্তু, যাঁহাকে স্বাত্মস্বরূপে জানিলে অমরত্ব লাভ হয়, তাঁহার কথাও বলিলেন।

যিনি আদি-বর্জ্জিত, যাঁহাকে সৎ-অসৎ কিছুই বলা যায় না সেই পরব্রহ্মই জ্ঞেয়—"অনাদিমৎপরং ব্রহ্ম ন সত্তন্নাসদুচ্যতে।" (১৩।১২) ইনি কিন্তু সগুণব্রহ্ম নহেন, বিগ্রহবান্ ভগবানও নহেন। আবার সঙ্গে সঙ্গে তিনিই যে বিশ্বরূপ ধারণ করেন তাহাও বলিলেন।

"সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোঽক্ষি-শিরো-মুখম্।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি। (১৩।১৩)।

এই নির্গুণ-সগুণাত্মক পুরুষকে জানিতে পারে কে? ঐ অধ্যায়ে বলিতেছেন "ধ্যানেন আত্মনি পশ্যন্তি কেচিদাত্মানমাত্মনা" (১৩।২৪)। আমার ভক্ত ক্ষেত্ররহস্য, জ্ঞানরহস্য এবং জ্ঞেয়-রহস্য জানিয়া তিনিই জ্ঞান, তিনিই জ্ঞেয়, তিনিই জ্ঞানগম্য ইহাও জানিয়া আমার ভাব লাভের অর্থাৎ ("সর্ব্বানর্থমূল-পরমানন্দভাবায় মোক্ষায়"—শ্রীমধুসূদন স্বামী) সর্ব্বদুঃখ-নিবৃত্তিরূপ পরমানন্দপ্রাপ্তিই যে মোক্ষ, তাহা পাইবার উপযুক্ত হন। এস্থলে ভগবান্ ভক্তি, জ্ঞান ও মুক্তি—এই শ্রুতিসিদ্ধ ক্রমই বলিয়াছেন।

যাহারা অধিকারী নহে তাহাদের পক্ষে ভক্তিপথ অপেক্ষা জ্ঞানপথে অধিকতর ক্লেশ ও হইবেই। কিন্তু যাঁহারা ভাবেন ও বলেন অব্যক্ত উপাসনার অধিকার কোন মানুষেরই হইতে পারে না, তাঁহারা 'ভ্রান্ত'। শ্রুতি বলেন কৈবল্যমুক্তি ভিন্ন সর্ব্বদুঃখনিবৃত্তিরূপ পরমানন্দে নিত্যস্থিতি অন্য কিছুতেই হইতে পারে না—"অতঃ সর্ব্বেষাং কৈবল্য-মুক্তির্জ্ঞানমাত্রেণোক্তা। ন কর্ম্ম সাঙ্খ্য-যোগোপাসনাদি-ভিরিত্যুপনিষৎ" (মুক্তি কোপনিষৎ)। অর্থাৎ কর্ম্ম, সাংখ্য, যোগ, ভক্তি প্রভৃতি উপায়ে সালোক্য সামীপ্য, সারূপ্য ও সাযুজ্য এই চারিপ্রকার মুক্তিলাভ হয়, কিন্তু কৈবল্য মুক্তি বিনা জ্ঞানে সাধিত হয় না। শ্রুতি বলেন "অদ্বৈত-দর্শনং জ্ঞানম্।" অদ্বৈত জ্ঞানই জ্ঞান। জীব ও ব্রহ্ম অভেদ বলিয়াই, জীব ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থান করিয়া পরমানন্দে স্থিতিলাভ করিতে পারেন। কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহ ভিন্ন অদ্বৈত বাসনা জন্মে না। "ঈশ্বরানুগ্রহাদেব পুংসামদ্বৈত বাসনা।" ঈশ্বরের অনুগ্রহ ভিক্ষা যেখানে তাহাই ভক্ত মার্গ। ভক্তি ভিন্ন জ্ঞানমার্গে যাওয়া যাইবে না। জ্ঞান দ্বারা মুক্তি, আবার ভক্তি দ্বারা জ্ঞান। বিনা ভক্তিতে জ্ঞান লাভ হয় না, কৈবল্যমুক্তিও হয় না। ভক্তিমার্গে ক্রম-মুক্তির বিধান আছে। ক্রমমুক্তি হইলে শেষে সদ্যোমুক্তি হইবেই। কারণ অন্যপ্রকার মুক্তিতে আংশিক দুঃখনিবৃত্তি হয় মাত্র। কিন্তু কৈবল্যমুক্তি ভিন্ন পরমানন্দে চিরস্থিতি হইবে না। শ্রুতি, স্মৃতি উভয়েরই এই মত।

শ্রীভগবানে ভক্তি যদি না থাকে, তবে যতই বেদ পাঠ দেখ না, তাহাতে মোহপ্রাপ্ত হইবে, শত জন্মেও জ্ঞান লাভ হইবে না। মুক্তি বা সর্বদুঃখনিবৃত্তিরূপ পরমানন্দে চিরতরে বিভিলাভও হইবে না। আত্মজ্ঞান ভিন্ন মুক্তি নাই। কিন্তু ভক্তি ভিন্ন জ্ঞানলাভের সম্ভাবনা নাই বলিয়া ভক্তিকেই মুক্তি বলা হয়। ঋষি প্রণীত শাস্ত্রে দেখা যায়—"সর্বং ব্রহ্মেতি যস্যাস্তর্ভাবনা স হি মুক্তিভাক্। ভেদদৃষ্টির্-বিপ্লবঃ সর্বদা তাং বিবর্জয়েৎ।" সমস্তই ব্রহ্ম—ইহাই যাঁহার অন্তর্ভাবনা তিনি মোক্ষভাগী। কিন্তু যেখানে অবিদ্যা, সেইখানে ভেদদৃষ্টি। উহা ত্যাজ্য। 'কৃষ্ণমূর্তি ভিন্ন ব্রহ্ম উপাসনায় কিছুই হইবে না—শক্তিমন্ত্র অসুরের জন্য, কৃষ্ণমন্ত্রই একমাত্র গ্রহণযোগ্য'—এই সমস্ত উক্তি অবিদ্যার পরিচয় প্রদান করে, ইহা ভেদদৃষ্টির ফল, সুতরাং উহা গ্রহণযোগ্য নয়।

পুরুষ, প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহংতত্ত্ব, পঞ্চতন্মাত্র, একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চমহাভূত—সাংখ্য এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব উল্লেখ করিয়াছেন। ভগবান্ পাতঞ্জলি ইহাতে ঈশ্বরতত্ত্ব যুক্ত করিয়া মোট ২৬টী তত্ত্বসংখ্যা করিয়াছেন অথর্ব উপনিষদ্ নানা-মন্ত্রে পরমেশ্বরের স্তুতি করেন—বিভু, পরমেশ্বর, অন্তর্যামী, মহেশ্বর, ঈশ্বর, পুরুষোত্তম ইত্যাদি। ইনি অন্তরাত্মা। এই অন্তরাত্মা মায়াধীশ। এই মায়াধীশ পর্যন্তই ২৬ তত্ত্ব। কিন্তু যিনি মায়ার অতীত, যিনি নির্গুণ, যিনি আপনিই আপনি—সেই অদ্বিতীয়রূপ তুরীয় ব্রহ্মই সপ্ত-বিংশ তত্ত্ব। আপনি আপনি ভাবটী "মায়াতীত" ব্রহ্ম। তিনিই আবার গুণাশ্রয়ে "মায়াধীশ"। গুণের অধীন যে চৈতন্য তিনিই জীব। (এই চৈতন্যকেই সাধারণ চৈতন্য বলা হয়—উহা উপাস্য নয়।) মায়াধীনা যিনি, তিনি বিশেষ বিশেষ কার্যের জন্য বিশেষ বিশেষ চৈতন্য আশ্রয়ে অবতাররূপ গ্রহণ করেন।

অজ্ঞাননাশ (অজ্ঞাননাশ) বা রাগক্ষয় (আসক্তিনাশ) কর্মদ্বারা সংসাধিত হয় না, কর্ম হইতে দোষাবহ কর্মেরই উদ্ভব হইয়া থাকে, সেই সমুদ্ভূত কর্ম হইতে আবার অবাঞ্ছিত সংসারই উৎপন্ন হয়। অতএব বিবেকিগণ জ্ঞানতত্ত্বানুশীলনে সবিশেষ যত্নবান থাকেন এবং যাবৎ মায়াহেতু শরীরাদিতে আত্মবুদ্ধি থাকে মাত্র তাবৎকালই বিহিত কর্ম করিতে থাকেন। পরে "ইহা নয়" "ইহা নয়" স্থির করিয়া নিখিল জগৎ প্রত্যাখ্যানপূর্বক পরমাত্ম-স্বরূপ অবগত হইয়া কর্মত্যাগ করেন। "নেতেতী বাক্যেরখিলং নিষিধ্যাতঃ, আত্মা পরাত্মানমবৈত্যতোঽসৌ ক্রিয়াঃ।" "কর্মত্যাগ করিলে প্রত্যবায়গ্রস্ত হইব" আত্মায় অনাত্মধর্ম-আরোপকারী এই যে বুদ্ধি, ইহা অজ্ঞানের নিকট প্রসিদ্ধ, তত্ত্বদর্শীর নিকট নহে। তত্ত্বদর্শী মুনিগণ কর্মত্যাগ করেন।

"পরত্যবায়ো হ্যস্মিত্যনাত্মধী
রজঃপ্রসিদ্ধা ন তু তত্ত্বদর্শিনঃ।
তস্মাদ্বুধৈ ত্যাজ্যমপি ক্রিয়াজাতং-
বিধানতঃ কর্ম বিধিপ্রকাশিতম্।"

(ব্যাসদেবপ্রণীত "রামগীতা" ২০)

শ্রুতিবাক্য (নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি) হইতে প্রমাণ দেখাইয়া ব্যাসদেব বলিতেছেন—"প্রসক্তরূপ বিহিত কর্মসমূহের ত্যাগকে বিহিত বলিয়া সাদরে স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন এবং বাজসনেয় শ্রুতিও বলিয়াছেন 'জ্ঞানই মুক্তির সাধক, কর্ম নহে'—

"সা নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিশ্রুতিরাহ সাদরং,
ত্যাগং প্রসক্তাখিলকর্মণাং স্ফুটম্।
এতাবদিত্যাহ চ বাজিনাং শ্রুতি-
র্জ্ঞানং বিমোক্ষায় ন কর্মসাধনম্। (রামগীতা, ২১)

যে জ্ঞানীকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজের আত্মস্বরূপ বলিয়া-ছেন—"জ্ঞানীত্বাত্মৈব মে মতম্" (গীঃ, ৭।১৮), জ্ঞানের নিন্দা বা অবজ্ঞা করা একান্তই অনুচিত।

'জ্ঞান' শব্দটী বহু অর্থে ব্যবহৃত হয়। জ্ঞা-ধাতু অনট্ (ল্যুট্) প্রত্যয় করিয়া জ্ঞানপদ সিদ্ধ হয়। ল্যুট্ প্রত্যয় বহু অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে—ভাববাচ্যে এবং কর্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান ও অধিকরণ বাচ্যেও ধাতুর উত্তর ল্যুট্ প্রত্যয় হয়। জানার ভাবটী জ্ঞান, যদ্দ্বারা জানা যায় তাহা জ্ঞান, যাহাকে জানা হয় তাহাও জ্ঞান। ব্রহ্মাত্মাকে জানাই জ্ঞান। বিনা সাধনায় কিন্তু জ্ঞান হয় না। এই জ্ঞান লাভের বহিরঙ্গ সাধনা— (ভগবান্ "চৈতন্যদেব"

ইহাকেই বলিয়াছেন "বহিরঙ্গ সাধকের নাম সংকীর্তন।" ঐ নাম সংকীর্তনে উক্ত তিন প্রকার সাধন চলে।)—নিষ্কাম কর্ম, আত্মসংযম যোগ, ভক্তিযোগ এবং অন্তরঙ্গ সাধন—সন্ন্যাস (নিত্যানিত্য বিচার সহ মুমুক্ষুর বৈরাগ্যাভ্যাসে) ও জ্ঞাননিষ্ঠা। বিনা সন্ন্যাসে জ্ঞান হইবে না। সমস্ত ত্যাগ অর্থাৎ সন্ন্যাস হয় চিত্তত্যাগ করিতে পারিলে। অহং ত্যাগেই চিত্তত্যাগ হয়। এই কারণে চিত্তত্যাগই প্রকৃত ত্যাগ, যথার্থ সন্ন্যাস।

চৈতন্য সমাধিভঙ্গে যোগী প্রসন্নচিত্ত, মনুষ্যত্বীন ও সর্বদা পরিতৃপ্ত থাকেন। সকল বস্তুই তাঁহার নিকট ব্রহ্ম হইয়া যায়। এই চৈতন্যস্থিতির ব্রহ্মভাবনাই—আত্মভাবনাই—ভগবদ্ভাবনাই জ্ঞানীর ভক্তি বা পরাভক্তি। আর্ত, জিজ্ঞাসু ও অর্থার্থীর ভক্তি তিন প্রকারের সকাম ভক্তি। (বহির্বৃত্তি) —তাহা গুণভেদে ত্রিবিধ—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। ইঁহাদের ভক্তি পরাভক্তি নহে। পরাভক্তি অর্থ চতুর্থ প্রকারের ভক্তি—নির্গুণা ভক্তি—নিষ্কাম ভক্তি—"এক-ভক্তি"। ব্রহ্ম ভাবনায় সামর্থ্য জন্মিলে পরাভক্তি লাভ হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হইয়াছে—

"সর্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥

অর্থাৎ যিনি সর্বভূতে ভগবদ্ভাব এবং পরমাত্মা শ্রীভগবানে সর্বভূত দর্শন করেন তিনিই ভাগবতোত্তম। শ্রীগীতাও বলিয়াছেন—"যো মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।"

জ্ঞানী যখন ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ করেন তখন তাঁহার নির্বিকল্প সমাধি। কিন্তু যখন ব্যুত্থান অবস্থায় আসেন, তখন তিনি আত্মাকে সর্ববস্তুতে দেখেন এবং সর্ববস্তুকে আত্মবৎই দেখেন। ইহাই পরাভক্তি। এই পরাভক্তি দ্বারা ভগবান্‌কে তত্ত্বতঃ জানা যায়। "ভক্ত্যা পরয়া ভক্ত্যা ভগবন্তং তত্ত্বতোঽভিজানাতি।" ঈশ্বর মায়া বা অবিদ্যা উপাধি দ্বারা বদ্ধ হন—"উপাধিকৃতবিশেষত্বেঃ" এবং সমস্তোপাধিশূন্য হইয়া তিনি তাঁহার প্রকৃত স্বরূপে থাকেন—"বিজ্ঞানঘনঃ সোপাধিভেদঃ আকাশ-কল্পঃ।" উপাধিযুক্ত ও উপাধিমুক্ত এই দুই অবস্থার সহিত তাঁহাকে জানাই "তত্ত্বতঃ জানা"। ইহা জ্ঞানরূপা—জ্ঞানলক্ষণা পরাভক্তি ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে জানা যায় না। পরমাত্মার স্বরূপ জানা ও পরমাত্মার পরমানন্দ-স্বরূপে প্রবেশ করা একই কথা। "ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মৈব ভবতি।" জানা ও হওয়া এখানে এক। এক্ষেত্রে জানিলেই হওয়া হইয়া যায়।

"নারায়ণে ভগবতি তদিদং বিশ্বমাহিতম্।
গূঢ়ৌতমায়োরুগুণঃ সর্গাদাবগুণঃ স্বতঃ॥"

(ভাঃ ২।৬।৩১)

অর্থাৎ এই জগৎ ভগবান্ নারায়ণে নিহিত রহিয়াছে, তিনি স্বতঃ স্বভাবতঃ অগুণঃ (নির্গুণঃ গুণলেশশূন্য), কারণ মায়া গ্রহণের পূর্বে গুণের প্রকাশই হয় না) কিন্তু সর্গাদৌ সৃষ্টির প্রারম্ভে "গূঢ়ৌতমায়া"-মায়া উপাধি গ্রহণ করিয়া উরুগুণঃ অশেষ গুণযুক্ত অর্থাৎ সগুণ হন। [ইহার দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, পরমাত্মার অগুণ (নির্গুণ) ভাবই নিত্য, উরুগুণ ভাব মায়িক, তাহা নিত্য নহে] আবার—

"হরির্হি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
স সর্বদৃগুপদ্রষ্টা তং ভজন্ নির্গুণো ভবেৎ॥"

(ভাঃ ১০।৮৮।৫)

অর্থাৎ শ্রীহরি তো প্রকৃতির পর (অতীত) স্বয়ং পুরুষ (উত্তম পুরুষ) এবং নির্গুণ (গুণলেশবর্জিত গুণাতীত)। [গুণ প্রকৃতির, অতএব তিনি "প্রকৃতেঃ পরঃ" প্রকৃতির অতীত হওয়াতে তাঁহাতে গুণের স্থানই নাই। সুতরাং নির্গুণঃ শব্দের অর্থ গুণগন্ধবিবর্জিত। নির্গুণ শব্দের অর্থ যদি এই স্থলে গুণ থাকা সত্ত্বেও গুণসম্পর্করহিত করা হয়, তাহা হইলে "পরঃ" শব্দের প্রয়োগ ব্যর্থ হইয়া পড়ে এবং পূর্ব উক্ত (ভাঃ ২।৬।৩১) শ্লোকের "অগুণঃ স্বতঃ" পদের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়।] তিনি ("গূঢ়ৌতমায়া" হইয়া—মায়া উপাধি গ্রহণ করিয়া) সর্বজ্ঞ এবং উপদ্রষ্টা—সর্বান্তর্যামী সাক্ষী। যিনি তাঁহার ভজন করেন, তিনি স্বয়ংও নির্গুণ ("অগুণ—গুণাতীত) হন।

যোগজ দৃষ্টি

শ্রীনলিনীকান্ত বসু

বিশ্ব অপূর্ব্ব সাজে সজ্জিত হইয়া বিরাজ করিতেছে। যেদিকে তাকাই সর্ব্বত্র অপূর্ব্ব দৃশ্য। দিবা ভাগে সূর্য্য তাহার প্রচণ্ড তাপ বিস্তার করিয়া বিশ্বকে আলোকিত করিতেছে, আবার নিশাগমে চন্দ্র তাহার স্নিগ্ধ শুভ্র জ্যোৎস্নায় বিশ্বকে অপরূপ শোভায় ভূষিত করিতেছে। মৃত্তিকার দিকে তাকাইলে, দেখিতে পাই সর্ব্বত্র সবুজ ঘাসে আচ্ছাদিত। চারিদিকে বৃক্ষ সবুজ পত্রে সুশোভিত হইয়া ফল ও ফুলভারে সজ্জিত। স্রোতস্বতী কুল কুল ধ্বনি সহ সমুদ্র দিকে ধাবিত হইতেছে। সবই অপূর্ব্ব। কিন্তু কে এই শিল্পী যিনি তাঁহার অপূর্ব্ব তুলিকা দ্বারা এই বিশ্বকে সুশোভিত করিলেন? ইহা কি চিন্তার বিষয় নয়? চিন্তাশীল মানব একটু চিন্তা করিলেই এই অপূর্ব্ব শিল্পীর কথা কল্পনা করিতে পারে। এই শিল্পী তিনি, যিনি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে ব্যাপ্ত থাকিয়া, সকল সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিতেছেন। ব্রহ্মই এই শিল্পী, যাঁহার নিপুণ হস্ত এই বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। এক ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুরই স্বতন্ত্র সত্তা নাই। জগতে আমরা যে নানাত্ব দেখি, তাহা ভ্রমাত্মক, জগতে নানাত্ব নাই। ব্রহ্ম এক, তিনি অবিভক্ত হইয়াও বিভক্তের ন্যায় সর্ব্বভূতে বিরাজিত। অসংখ্য প্রাণবন্ত জীব এই বিশ্বে বিরাজ করে, এই জীবগণ প্রাণবন্ত হয়ে নানাত্ব সৃষ্টি করিয়াছে বটে, কিন্তু জীবকে প্রাণবন্ত করেছেন ব্রহ্মেরই অংশ; তাহাকে আমরা আত্মা নামে পরিচয় দেই। এই দৃষ্টি না থাকিলে ব্রহ্ম অনুভূতির বাইরে থাকেন। যিনি বহির্জগতে স্থাবর জঙ্গম সর্ব্ব পদার্থকে এবং অন্তর্জগতে ইন্দ্রিয়বৃত্তি, মন, বুদ্ধি যাহা কিছু আছে, তাহাদের সকলকে স্বাধারূপী দেখেন, তিনিই যোগী।

যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি

তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি। গীতা

প্রণশ্যামি শব্দের অর্থ পরোক্ষ হয় না, প্রপশ্যতি—দেও আমার পরোক্ষ হয় না। পশ্যতি মানে দেখা, বিশ্ব মানব চক্ষে ব্রহ্মদর্শন সম্ভব নয়, তিনি কখনও দৃশ্য হয়েন না। তিনি যে দ্রষ্টা; সুতরাং পশ্যতির অর্থ অনুভব করা। যে যোগী তাঁহাকে মানবে মানবে, বৃক্ষে, আকাশে, পাখিরে, জলে—যাহা তাঁহারই ভাবান্তর মাত্র—দেখেন একমাত্র তিনিই হৃদয়ে ব্রহ্মের আভাষ লাভ করিতে পারেন।

সর্ব্বভূতস্থম্ আত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।

ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ। গীতা

সর্ব্বভূতে আত্মাকে যে দেখিতে পারে, আবার নিজ আত্মায় সর্ব্বভূত বিরাজ করেন, এরূপ সমদর্শী হতে পারেন, তিনিই ব্রহ্মজ্ঞানী। এরূপ ব্রহ্মজ্ঞানী পুরুষের মনে হিংসা দ্বেষ কলহের স্থান কোথায়? এরূপ লোকের ভালবাসাই প্রকৃত ভালবাসা, কারণ তিনি দেখেন, তাহার ভালবাসার জিনিষ স্বয়ং ভগবান্।

এইরূপ জ্ঞানলাভ করা যায় কি উপায়ে?

ইহার উপায় অনুসন্ধান করিতে হইলে প্রথমেই চঞ্চল মনকে দমন করিতে হইবে। মনই আমাদের ইন্দ্রিয়গণকে বিমোহিত করিয়া উন্মার্গে চালিত করে। তাহার উত্তরে ভগবান্ গীতায় বলেন অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা চঞ্চল মনকে শান্ত ও স্থির করা যায়। "অভ্যাসেন বৈরাগ্যেন চ গৃহ্যতে।" বৈরাগ্য লাভের উপায় সর্ব্বত্র ঈশ্বর দর্শন। যে কর্ম্ম করি, তাহা ঈশ্বরের কর্ম্ম, যে ভোগ্য বস্তু আমরা ভোগ করি, তাহা দেহাস্থিত ঈশ্বরেরই ভোগ্য অর্থাৎ ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে নিবেদন করা। জগৎচক্র প্রবর্ত্তনের জন্য জাগতিক সকল কর্ম্ম করিতে হইবে। যোগদৃষ্টি লাভ হইলে আত্মপর ভেদবুদ্ধি লোপ পায়। এইভাবে আত্মাকে সর্ব্বভূতে, সর্ব্বাত্মা ঈশ্বরকে সর্ব্বত্র অনুভব করিতে হইবে। এইরূপ

ধারণায় আস্থিত হইয়া যিনি ঈশ্বর ভজনা করেন এবং নিজেকে তাঁহাতে অবস্থিত অনুভব করেন, তাঁহার আর কোন ভেদবুদ্ধি থাকে না। সমস্তজীবের সুখ দুঃখ নিজের সুখ দুঃখ বলিয়া মনে করেন ঈশ্বরের জন্য কর্ম লোক-স্থিতির জন্য কর্ম—এইভাবে আসক্তি বিহীন হইয়া কর্ম করিতে হয় ইহাই প্রকৃত বৈরাগ্য। চিত্তসংযম হইলে নগর ও বন দুইই সমান হয় ঈশ্বর উদ্দেশ্যে কর্ম করিলে সব কর্মই অকর্ম হয় অর্থাৎ ফলাশা থাকে না। চিত্ত সংযম অভ্যাস করিতে হইলে, কয়েকটি উৎকৃষ্ট প্রণালী অভ্যাস করিতে হয়।

১। গুরুদত্ত ইষ্টমন্ত্র জপ,—যখন মন স্থির থাকে এবং সদ্‌গুরুর উপদেশানুযায়ী সময়ে নির্জনে ইষ্টমন্ত্র মালায় জপ। জপের সময় অন্য সকল বিষয় চিন্তা হইতে বিরত থাকা। জপের সংখ্যা যত বৃদ্ধি পায়, ততই মন একাগ্র হয়।

২। মনকে সর্বদা ধর্ম ও নীতি সম্মত ও লোকহিতকর কার্যে ব্যাপৃত রাখা।

৩। কোন দেবমূর্তি বা গুরুমূর্তির ধ্যান। তাঁহাদের চরিত্র আলোচনা, তাঁহাদের জীবনের আদর্শে নিজ জীবন গঠিত করিতে, পবিত্র রাখিতে চেষ্টা করা।

৪। সদনে স্বপনে সর্বদা ইষ্টনাম মনে মনে জপ—ঐ সবই সিদ্ধ হইবার উপায়।

এইভাবে চিত্তবৃত্তি নিরোধ হইলে, মন আর বিষয়ে আকৃষ্ট হইবে না। তখন মন সংযত হইবে এবং নিজ মন কর্ম সবকিই ঈশ্বরে অর্পিত হইবে।

অসংযতাত্মনা যোগো দুষ্প্রাপ ইতি মে মতিঃ।
বশ্যাত্মনা তু যততা শক্যোঽবাপ্তুমুপায়তঃ॥ গীতা

ব্রাহ্মণাদি বর্ণ কি জন্মগত অথবা গুণকর্ম্মগত ?

(কোষ্ঠী শাস্ত্রসম্মত)

ডক্টর অমরপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য এম. এ, পি-এইচ. ডি, বেদান্তশাস্ত্রী, কাব্য-বেদান্ত-বেদান্ততীর্থ।

(১৩) যদি জন্মগত চাতুর্বর্ণ্যবিভাগ স্বীকার না করা যায় তাহা হইলে প্রাচীনকাল হইতে যে ব্রাহ্মণাদিজাতির মর্য্যাদা প্রবাহরূপে প্রবাহিত হইতেছে তাহা বাধিত হয়। পূর্বকালে পরশুরাম, দ্রোণাচার্য্য, কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ ক্ষাত্রবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন। কিন্তু তজ্জন্য তাঁহারা কেহই ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিগণিত বা স্বীকৃত হন নাই, পরন্তু ব্রাহ্মণ হইয়াও ক্ষাত্রধর্ম গ্রহণ করায় নিন্দিতই হইয়াছেন—ইহা মহাভারতাদি হইতে অবগত হওয়া যায়। ইহার দ্বারা চাতুর্বর্ণ্যবিভাগ যে জাতিগত বা জন্মগত—ইহাই প্রমাণিত হয়।

১৪। যদি চাতুর্বর্ণ্যবিভাগ জন্ম বা জাতিগত না হইত তাহা হইলে যযাতির ন্যায় প্রসিদ্ধ ধার্মিক রাজা দেবযানীকে ও রাজর্ষি দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে বিবাহ করিতে প্রথমে কুণ্ঠিত হইতেন না, এবং শ্রীনন্দাদিগোপগণ নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণভক্ত হইয়াও জাতিগত বৈশ্যত্ব স্বীকার করিতেন না। যদি চাতুর্বর্ণ্যবিভাগ জাতিগত না হইত তবে ব্রাহ্মণোচিত গুণসম্পন্ন বিদুর শূদ্র বলিয়া গণ্য হইতেন না, এবং যুধিষ্ঠির ও উদ্ধব ব্রাহ্মণোচিত গুণসম্পন্ন হইলেও ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত হইতেন না। আবার যুধিষ্ঠির ও ভীমের গুণে আকাশ পাতাল প্রভেদ, তথাপি উভয়েই ক্ষত্রিয় বলিয়া নির্দিষ্ট। ইহার দ্বারা বুঝা যায় যে জন্মানুসারেই বর্ণ বা জাতি নির্দিষ্ট হয়।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও অবতারকালে জাতিগত ব্রাহ্মণের সম্মান রক্ষা করিবার জন্য যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে জাতিগত ব্রাহ্মণগণের পাদপ্রক্ষালনের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। আবার, জাতিগত ব্রাহ্মণের সম্মানরক্ষার্থ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ

এবং পাণ্ডবগণ অশ্বত্থামার ন্যায় ক্ষত্রিয়ধর্মগ্রহণকারী আততায়ী ব্রাহ্মণের (যে পঞ্চপাণ্ডবের নিদ্রিত পঞ্চ শিশু পুত্রকে হত্যা করিয়াছিল) প্রাণদণ্ড না করিয়া তাঁহার শিরোমুণ্ডন গ্রহণ পূর্ব্বক স্থান হইতে বিতাড়িত করিয়াছিলেন। ঐ প্রকরণে বেদব্যাসও "ব্রহ্মবন্ধুর্ন হন্তব্য: আততায়ী বধার্হণঃ" এবং "মণ্ডনং ত্রাসিণাদানং স্থানান্নির্যাপনং তথা। এষ হি ব্রহ্মবন্ধূনাং বধো নান্যোঽস্তি দৈহিকঃ"—(ভাগঃ ১।৭।৫৩,৫৭ –(অর্থাৎ, "ব্রাহ্মণ অবধ্য, কিন্তু আততায়ী বধ্য; শিরোমুণ্ডন, ধনাপহরণ, এবং দেশ হইতে নির্বাসন করিলেই ব্রাহ্মণদিগের দণ্ড বিহিত হয়, তদ্ভিন্ন তাঁহাদিগের শারীরিক বধদণ্ড নাই")—এইরূপই বলিয়াছেন। **এই সকল দৃষ্টান্তের দ্বারাও ব্রহ্মণাদি বর্ণ যে জাতিগত বা জন্মগতই হইয়া থাকে, তাহা সিদ্ধ হয়।**

(১৫) মহাভারতের আদিপর্ব্বে দেখা যায় যে পরশুরাম কর্ত্তৃক পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া হইলে পরে ব্রাহ্মণজাতি কর্ত্তৃক ক্ষত্রিয়া স্ত্রীতে ক্ষেত্রজ পুত্ররূপে পুনর্ব্বার ক্ষত্রিয়জাতি সৃষ্ট হইয়াছিল এবং এইরূপ নিদর্শন হইতে মহাত্মা ভীষ্ম বেদব্যাস দ্বারা ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুকে ক্ষেত্রজ পুত্ররূপে উৎপাদন করাইয়া কুরুবংশ রক্ষা করিয়াছিলেন। (মহাভাঃ আদিপঃ ২৮ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুও দাক্ষিণাত্য ভ্রমণকালে ও নীলাচলে থাকাকালে শ্রীরামানন্দাদি বৈষ্ণবাগ্রণ্য কায়স্থ ব্যক্তিগণের গৃহে ভিক্ষাগ্রহণ না করিয়া জাতিগত ব্রাহ্মণত্বের মর্য্যাদারক্ষণার্থ ব্রাহ্মণজাতির গৃহে ভিক্ষাগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সকল দৃষ্টান্তের দ্বারাও চাতুর্ব্বর্ণ্যবিভাগ যে জন্ম বা জাতিগত—ইহাই প্রতিপন্ন হয়।

(১৬) ব্রহ্মসূত্রের অপশূদ্রাধিকরণ (ব্রঃ. সূ. ১।৩।৩৪—৩৮ সূত্র) জানশ্রুতি রাজার জাতিগত ক্ষত্রিয়ত্ব স্বীকার করিয়া শূদ্রের বেদাধ্যয়নাধিকার নিষেধ করায় জাতিগত চাতুর্ব্বর্ণ্যের উল্লেখ শ্রবণ করা যায়।

(১৭) ছান্দোগ্য উপনিষদে উক্ত হইয়াছে—"তদ্য ইহ রমণীয়চরণা অভ্যাশো হ যত্তে রমণীয়াং যোনিমাপদ্যেরন্ ব্রাহ্মণযোনিং বা ক্ষত্রিয়যোনিং বা বৈশ্যযোনিং বা। অথ য ইহ কপূয়চরণা অভ্যাশো হ যত্তে কপূয়াং যোনিমাপদ্যেরন্ শ্বযোনিং বা, শূকরযোনিং বা চণ্ডালযোনিং বা" —(ছান্দোগ্য উপঃ ৫।১০।৭)—অর্থাৎ ইহলোকে যে সকল ব্যক্তি রমণীয় পুণ্য কর্ম্মের আচরণ করেন, তাঁহারা পরজন্মে রমণীয় যোনি (জন্ম) প্রাপ্ত হন, যেমন ব্রাহ্মণযোনি (ব্রাহ্মণজন্ম), ক্ষত্রিয়যোনি বা বৈশ্যযোনি। আর যাঁহারা ইহলোকে নিন্দনীয় পাপ কর্ম্মের আচরণ করেন তাঁহারা পরজন্মে নিন্দনীয় অন্যত্র যোনি প্রাপ্ত হন, যেমন কুক্কুর যোনি, শূকরযোনি বা চণ্ডালযোনি।

এই শ্রুতিবাক্যে সুস্পষ্টভাবেই বলা হইল যে ব্রাহ্মণাদি বর্ণ জাতিগত বা জন্মগতই।

(১৮) অতএব ক্ষত্রিয়াদিকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া যদি কেহ তপস্বী ও সত্যযুক্ত হন বা অন্যান্য ব্রাহ্মণোচিত সদ্গুণান্বিত হন, তাহা হইলেও তিনি ব্রাহ্মণ বলিয়া অভিহিত হইবেন না। এইরূপ হইলে বৈষ্ণবাগ্রণ্য অম্বরীষ প্রভৃতি রাজর্ষিগণও ব্রাহ্মণ বলিয়া অভিহিত হইতেন। বহু সৌভাগ্যে বিবাহিত ব্রাহ্মণ পিতামাতা হইতে জন্মলাভ ব্যতীত ক্ষত্রিয়াদি বৈষয়িকগণ বহু তপস্যা করিয়াও যে এই জন্মে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে পারেন না, তাহা মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্বে সপ্তবিংশ অধ্যায়ের ভীষ্ম-যুধিষ্ঠির সংবাদ হইতেও ঊনত্রিংশ অধ্যায়ের ইন্দ্র-মতঙ্গ সংবাদ হইতে সুস্পষ্টরূপে অবগত হওয়া যায়, যথা :—

"ব্রাহ্মণ্যং তাত দুষ্প্রাপ্যং বর্ণৈঃ ক্ষত্রাভিবৃদ্ধিভিঃ।
পরাং হি সর্ব্বভূতানাং স্থানমেতদ্ যুধিষ্ঠির।
বহ্বীস্ত সংসরন্ যোনীর্জায়মানঃ পুনঃ পুনঃ।
পর্য্যায়ে তাত কস্মিংশ্চিদ্ ব্রাহ্মণো নাম জায়তে।"

—মহাঃ অনুঃ ২৭।৫-৬

"বহ্বীস্ত সংবিশন্ যোনীর্জায়মানঃ পুনঃ পুনঃ।
পর্য্যায়ে তাত কস্মিংশ্চিদ্ ব্রাহ্মণ্যমিহ বিন্দতি।"

—মহাঃ অনুঃ ২৯।১১

এখানে স্পষ্টই বলা হইল যে জীব বহু যোনি ভ্রমণ করতঃ পুনঃ পুনঃ জন্মলাভ করিয়া বহু পুণ্যফলে কোন পর্য্যায়ে (কোন জন্মে) ব্রাহ্মণ হইয়া জন্মগ্রহণ করে। ক্ষত্রিয়াদি বৈষয়িক কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণত্ব দুষ্প্রাপ্য ... ইত্যাদি।

কলিযুগে তপস্যা প্রভৃতির হ্রাস হইয়া যাইবে, এই হেতু শাস্ত্রে কলিযুগে বীর্য্যের (জন্মের) প্রধানতার উপর অধিক

জোর দেওয়া হইয়াছে, যথা :—

কলৌ ব্রাহ্মণতা বার্ষ্যাৎ তপশ্চর্য্যাদিনা ন হি।
শুদ্ধং স্বতশ্চতামেতি শোধনাদ্ধ্যতে পুনঃ।
যচ্চ স্বভাবতোঽশুদ্ধং তচ্চ শুদ্ধির্ন যাতি তে।
যথা তস্মাদ্বিনির্যোগাত্তৈজসং ন যাতে পুনঃ।

মূত্রং শুদ্ধিং ন বাপ্নোতি গঙ্গাশতশ্রবণাদপি।"—কৌশিক সংহিতা :—অর্থাৎ কলিযুগে বীর্য্য হইতেই অর্থাৎ জন্মদ্বারাই ব্রাহ্মণত্ব মান্য করিতে হইবে। যে ব্যক্তি বীর্য্য হইতে অর্থাৎ জন্ম হইতে ব্রাহ্মণ নহে সে এই কলিযুগে এই জন্মেই তপস্যা প্রভৃতির দ্বারা ব্রাহ্মণ হইতে পারে না। কারণ স্বভাবতঃ শুদ্ধ জিনিষ কোন কারণে অশুদ্ধ হইলে শোধনের দ্বারা তাহা পুনঃ শুদ্ধ হইতে পারে। কিন্তু যাহা স্বভাবতঃ অশুদ্ধ (জন্ম হইতেই অশুদ্ধ) তাহা কোনপ্রকারে শুদ্ধ হইতে পারে না। যেমন সুবর্ণ-রজতাদি মলের দ্বারা অশুদ্ধ হইলে পর ভস্ম, অগ্নি প্রভৃতির দ্বারা পুনঃ শুদ্ধ হইতে পারে। কিন্তু স্বভাবতঃ অশুদ্ধ মলমূত্রাদি গঙ্গাজলে শতবার ধুইলেও শুদ্ধ হইতে পারে না।

এখানে প্রসঙ্গতঃ বিশ্বামিত্রের কথা উল্লেখযোগ্য। মহর্ষি বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয়জাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়া কঠোর তপস্যা ও মহেশ্বরগ্রহে ব্রাহ্মণত্বলাভ করিয়াছিলেন—এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। কিন্তু তাঁহার দৃষ্টান্ত ব্যতিক্রম,—ইহা সাধারণ নিয়ম নহে এবং ইহা কলিযুগের ঘটনাও নহে। ইহা ত্রেতাযুগের কথা। মহর্ষি বিশ্বামিত্র ত্রিবিধ কারণে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন যথা :—(১) তাঁহার পিতামহ কৌশিক ঋষিদিগের নিকট হইতে বরলাভ করিয়াছিলেন যে তাঁহার বংশের কোন সন্তান ব্রাহ্মণ হইবে; (২) বিশ্বামিত্রের মাতা দৈবপ্রেরণায় ব্রাহ্মণ সন্তানোৎপাদক যজ্ঞীয় চরু ঋষিপত্নীর নিকট হইতে পরিবর্তন করিয়া ভক্ষণ করিয়াছিলেন; (৩) বিশ্বামিত্রের দীর্ঘকালব্যাপী কঠোর তপস্যা ও ব্রহ্মর্ষি মহাপুরুষ বশিষ্ঠের ও লোকপিতামহ ব্রহ্মার অনুগ্রহপ্রাপ্তি। এই ত্রিবিধ কারণে বহু কষ্টে বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন। সুতরাং তাঁহার দৃষ্টান্ত ব্যতিক্রমস্থল, ইহা স্বাভাবিক ও সাধারণ নিয়ম নহে। যেমন প্রকৃতি বা স্বভাবের নিয়মে জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়াদি কার্য্য চলিতেছে, কেহই তাহার অন্যথা করিতে পারে না। কিন্তু অসাধারণ কোন কোন যোগী কঠোর সাধনায় অনিমাদি ষোড়শৈশ্বর্য্যলাভ করিয়া সেই প্রকৃতি বা স্বভাবের নিয়মকেও বশে আনিতে পারেন, প্রকৃতি বা স্বভাবেরও অন্যথা করিতে পারেন, কিন্তু অন্যে তাহা পারে না। প্রকৃতি বা স্বভাবের অন্যথা হওয়া সাধারণ নিয়ম নহে। বিশ্বামিত্রের পক্ষেও এ কথা প্রযোজ্য।

(১৯) আবার, কেবল ব্রাহ্মণ পিতামাতা হইতে জন্ম-গ্রহণ করিলেই যে সকলে ব্রাহ্মণোচিত কর্ম্মসকলে অধিকারী হইবেন শাস্ত্রে এইরূপ বলেন না। কিন্তু ব্রাহ্মণ পিতামাতা হইতে জন্মলাভ করিয়া উপনয়ন, শাস্ত্রজ্ঞান, তপস্যা ও চরিত্রযুক্ত ব্যক্তিই ব্রাহ্মণোচিত কর্ম্মসকলে অধিকারী হন, অন্যে নহে।

(২০) যদি ব্রাহ্মণত্বাদি জাতিগত না হইয়া কেবল গুণকৃত হইত তাহা হইলে ক্ষত্রাদি ব্রাহ্মণগুণরহিত ব্রাহ্মণকুমার শৃঙ্গীর অভিশাপকে পরীক্ষিতের ন্যায় রাজর্ষি ব্রহ্মশাপ জ্ঞান করিয়া সন্তপ্ত মনে গঙ্গাতীরে প্রায়োপবেশন করিতেন না, অথবা মহাভাগ বহুগণ রাজা "নমো মহদ্ভ্যোঽস্তু নমঃ শিশুভ্যো নমো যুবভ্যো নম আবটুভ্যঃ"। যে ব্রাহ্মণা গামবধূতলিঙ্গাশ্চরন্তি তেভ্যঃ শিবমস্তু রাজ্ঞাম্" (ভাগঃ ৪।১৩।২৩)—অর্থাৎ (মহান্ ব্রাহ্মণগণকে আমার নমস্কার। শিশু ব্রাহ্মণগণকে নমস্কার, যুবাব্রাহ্মণগণকে নমস্কার, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ অবধি সকল ব্রাহ্মণকে নমস্কার। যে সকল ব্রাহ্মণ অবধূতবেশে পৃথিবীতে ভ্রমণ করেন তাঁহাদিগকেও আমার নমস্কার। তাঁহাদিগের কৃপায় রাজাদিগের মঙ্গল হউক)—এইরূপ বলিয়া সকল বয়সের ব্রাহ্মণকুলের নমস্কার করিতেন না। ইহার দ্বারাও ব্রাহ্মণত্বাদি জাতি বা জন্মগতত্বই প্রমাণিত হয়।

(২১) শ্রীভগবাবেশাবতার পৃথুরাজা ঈশ্বরবুদ্ধিতে যে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় জাতিকে নমস্কার করিয়াছিলেন উহার জাতিগত বর্ণবিভাগ স্বীকার না করিলে, এবং তিনি যে ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবকুল ভিন্ন অন্যত্র দণ্ডবিধান করিতেন ইহারও জাতিগত ব্রাহ্মণকুল স্বীকার না করিলে সামঞ্জস্য হয় না। (ভাগবত ৪।২১ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)

(২২) যদি ব্রাহ্মণ শব্দে জাতিগত ব্রাহ্মণকে না

বুঝাইয়া কেবলমাত্র ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিকেই বুঝাইত তবে শ্রুতিতে যে "জায়মানো হ বৈ ব্রাহ্মণস্ত্রিভিঃ ঋণবান্ জায়তে" (ব্রাহ্মণ জন্মগ্রহণ করিয়াই তিনটি ঋণে আবদ্ধ হন), এবং "তমেতমাত্মানং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসা" (বৃহঃ ৪।৪।২২)—(সেই এই আত্মাকে ব্রাহ্মণগণ বেদবাক্য, যজ্ঞ, দান ও তপস্যার দ্বারা জানিতে ইচ্ছা করেন)—ইত্যাদি শ্রুতিতে যে **অজাতব্রহ্মবিজ্ঞান** ব্যক্তিকে ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন তাহা বাধিত হয়।

(২৩) শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্যও বিবেকচূড়ামণিগ্রন্থে "জন্তূনাং নরজন্ম দুর্লভমতঃ পুংস্ত্বং ততো বিপ্রতা। তস্মাদ্ বৈদিকধর্ম-মার্গপরতা বিদ্বত্ত্বমস্মাৎ পরম্"—এই উক্তিতে নরজন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ পুরুষত্ব, বিপ্রত্ব, বৈদিকধর্মমার্গানু-সারিত্ব ও বিদ্বত্ত্ব—এইগুলির ক্রমিক উৎকর্ষ দেখাইয়াছেন। ইহাতেও জাতিগত ব্রাহ্মণত্বের সিদ্ধি হয়।

(২৪) এখানে উল্লেখযোগ্য যে মহাভারতের বনপর্বে অজগর-যুধিষ্ঠির সংবাদে "সত্যং দানং ক্ষমা শীলমানৃশংস্যং তপো ঘৃণা। দৃশ্যন্তে যত্র নাগেন্দ্র! স ব্রাহ্মণ ইতি স্মৃতঃ।" (মহাভাঃ বনপর্ব, ১৮০।২১) ইত্যাদি বচনে যে গুণকৃত বা আচারগত ব্রাহ্মণের লক্ষণ শ্রবণ করা যায়, উহার তাৎপর্য ইহাই যে উপযুক্ত সদ্গুণযুক্ত ব্রাহ্মণে উল্লিখিত সত্য, দান, ক্ষমা প্রভৃতি গুণগুলি থাকিবে। সত্যাদিগুণবিশিষ্ট ব্রাহ্মণের প্রশংসায় উহার তাৎপর্য, কিন্তু উহাতে জাতিগত ব্রাহ্মণত্বের নিষেধ করা হয় নাই। সেখানে যে বলা হইয়াছে যে—যাহার সত্য, দান, ক্ষমা প্রভৃতি গুণ আছে, সেই ব্রাহ্মণ, কিন্তু যাহার এই সকল গুণ নাই, সে ব্রাহ্মণ হইলেও ব্রাহ্মণ নহে; যে শূদ্রে এই সকল গুণ আছে, সে শূদ্র হইলেও শূদ্র নহে,...ইত্যাদি—এইস্থলে "ব্রাহ্মণ" ও "শূদ্র" শব্দ দুইটি দুই বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা হইয়াছে। এক অর্থ—যাহার বর্ণ ব্রাহ্মণ এবং অপর অর্থ যাহার ব্রাহ্মণোচিত গুণ আছে 'ব্রাহ্মণ' শব্দের এই দুইটি অর্থ এখানে অভিপ্রেত। সেইরূপ 'শূদ্র' শব্দেরও এখানে দুই প্রকার অর্থ—এক অর্থ, যাহার বর্ণ শূদ্র, অপর অর্থ যাহার শূদ্রোচিত গুণ আছে। এখানে ঐরূপ দুইটি বিভিন্ন অর্থ গ্রহণ না করিলে "সে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ নহে," বা "সে শূদ্র শূদ্র নহে"—এইরূপ উক্তি পরস্পর বিরোধী হয়। মহা-ভারতের অন্তর্গত এই বর্ণোৎকর্ষনের উদ্দেশ্য ক্ষমা, দয়া, সত্য প্রভৃতি সদ্গুণের প্রশংসা করা। বর্ণ নির্ণয় করার ব্যবস্থা দেওয়া এই সকলের উদ্দেশ্য নহে। কারণ এইরূপ উদ্দেশ্য হইলে অন্য শাস্ত্রবাক্যসমূহের সহিত বিরোধ হয়। আর যদি বর্ণ নির্দেশ করাই এই সকলের উদ্দেশ্য হইত তবে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বর্ণেরও নির্দেশ থাকিত। কিন্তু এখানে তাহা নাই। কেবল ব্রাহ্মণ ও শূদ্রেরই উল্লেখ আছে।

(২৫) গীতাদি শাস্ত্রে যে উক্ত হইয়াছে—

"শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম স্বভাবজম্।
শৌর্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম স্বভাবজম্।" ইত্যাদি

গীতা—১৮।৪২-৪৩

(অর্থাৎ শম, দম, তপস্যা, শৌচ বা সদাচার, ক্ষমা, সরলতা, জ্ঞান, বিজ্ঞান, আস্তিক্যবুদ্ধি বা শাস্ত্রিকী শ্রদ্ধা—এইসকল ব্রাহ্মণের স্বভাবজাত কর্ম। পরাক্রম, তেজ, ধৈর্য, দক্ষতা, যুদ্ধে অপরাঙ্মুখতা, দান, প্রভুত্ব—এইগুলি ক্ষত্রিয়ের স্বভাব-জাত কর্ম)—এই সকল বাক্যের তাৎপর্য হইল ব্রাহ্মণ-জাতির শৌর্য্যাদিপ্রধান কর্ম ইত্যাদি প্রদর্শন করা। অর্থাৎ পূর্ব হইতে জন্মের দ্বারা সিদ্ধ যে ব্রাহ্মণাদি জাতি, সেই ব্রাহ্মণাদি জাতির কর্তব্য কর্মাদির প্রতিপাদনই উক্ত শ্লোক-সমূহের উদ্দেশ্য, কিন্তু উহা ব্রাহ্মণাদির লক্ষণ নহে। কারণ যদি শমাদিগুণসম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রই ব্রাহ্মণ হইতেন তাহা হইলে শমদমাদিগুণসম্পন্ন বিদুর, অম্বরীষ প্রভৃতি মহাত্মা-গণও ব্রাহ্মণ হইতেন।

(২৬) বজ্রসূচিকোপনিষদের—"কো ব্রাহ্মণো নাম? যঃ কশ্চিদ্বিতীয়ং জাতিগুণক্রিয়াহীনং সত্যজ্ঞানাদিলক্ষণ-পরোক্ষীকৃত্য কৃতার্থতয়া কামাদিরহিতো বর্ততে এবমুক্ত-লক্ষণো যঃ স এব ব্রাহ্মণ ইতি।" ইত্যাদি উক্তিতে ব্রাহ্মণের যে লক্ষণ বলা হইয়াছে তাহা "ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ" এইরূপ ব্রহ্মবিদ্ ব্রাহ্মণের লক্ষণ, উহা

চতুর্বর্ণান্তর্গত ব্রাহ্মণের লক্ষণ নহে—ইহা ঐ বাক্যের অর্থের মধ্যেই সুস্পষ্ট।

(২৭) স্মৃতিশাস্ত্রে জাতিগত চাতুর্বর্ণ্য বিভাগ স্বীকার করিয়া পরে জাতিভেদে আশ্রমধর্ম, বিবাহ, প্রায়শ্চিত্ত, অশৌচ ও নিত্যনৈমিত্তিকাদি কর্মের তারতম্যস্বীকার প্রদর্শন করা যায়। প্রায়শ্চিত্তপ্রকরণে ব্রহ্মাদি চাতুর্বর্ণ্যের প্রায়শ্চিত্তের লাঘব-গৌরব স্বীকার করিয়াছেন। যেমন শূদ্রের একগুণ, বৈশ্যের দ্বিগুণ, ক্ষত্রিয়ের ত্রিগুণ ও ব্রাহ্মণের চতুর্গুণ প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা উক্ত হইয়াছে।

অতএব উপরে লিখিত শাস্ত্রপ্রমাণ ও যুক্তিবলে ইহাই প্রমাণিত হয় যে ব্রাহ্মণাদি বর্ণবিভাগ বা জাতিভেদ জন্মগতই, গুণকর্মকৃত নহে। পূর্বে জন্মের দ্বারা জাতিভেদের অস্তিত্ব, পরে সেই সেই জাতির উচিত গুণকর্মবিভাগ—ইহাই শাস্ত্রমত। জীবের প্রারব্ধ সংস্কার ও কর্মানুসারে শ্রীভগবান কর্তৃকই তাহার ব্রাহ্মণাদি যোনিতে জন্মলাভ হইয়া থাকে। সুতরাং এই জাতিভেদ বা বর্ণভেদ ঈশ্বরসৃষ্ট, কোন মনুষ্যসৃষ্ট নহে। গীতার "চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং" শ্লোকে (গীতা ৪।১৩) 'ময়া' পদের দ্বারা এই বর্ণভেদ যে ঈশ্বরসৃষ্ট তাহাই বলা হইয়াছে। পূর্বে উল্লিখিত "ব্রহ্মণোঽস্য মুখ মাসীৎ" ইত্যাদি শ্লোক (ঋগ্‌বেদ. পুরুষসূক্ত ১০।৯০।১২), "মুখবাহুরুপজ্জানাং..." ইত্যাদি (মনু ১।৮৭), "মুখবাহুরু পাদেভ্যঃ ইত্যাদি (ভাগঃ ১১।৫।২) প্রভৃতি শাস্ত্রবাক্যসমূহের দ্বারা জাতিভেদ বা বর্ণভেদ ঈশ্বরসৃষ্ট তাহাই উক্ত হইয়াছে। (ঐসকল শ্লোক বঙ্গানুবাদ সহ পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা দ্রষ্টব্য) (ক্রমশঃ)

গীতোক্ত
শ্রীভগবদবতারতত্ত্ব ও বিশ্বরূপদর্শন

শ্রীধর্মদাস দাস

(পূর্বানুবৃত্তি)

শ্রীভগবানের প্রদর্শিত বিশ্বরূপে অশেষ বর্ণের সমাবেশ, অবর্ণনীয় আকৃতির আবির্ভাব, অথবা তাহাতে ভূত যে কি আছে, তাহা ভাষাতীত। ভক্তের আরাধনায় ভগবান্ একাধারে নিজদেহে দ্বাদশ আদিত্য, অষ্টবসু একাদশ রুদ্র, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, উনপঞ্চাশ মরুৎ এবং আরও কত দেবতা দেখাইলেন। ইহাতেই প্রমাণিত হয় একমাত্র সচ্চিদানন্দ পুরুষোত্তমের সেবাতেই, বিনা তপস্যায়, সব দেবতার দর্শন জীবের ধারণাতীত বহু আশ্চর্য পদার্থও নয়নগোচর হয়; ভগবানের স্থূলদেহের একাংশমাত্রে সমগ্র জগৎ নয়ন সম্মুখে উদ্ভাসিত হইয়াছে। যে জগৎ অযুতবৎসরে পরিভ্রমণ করা সাধ্যাতীত, সেই জগন্মণ্ডল ভক্তের সম্মুখে ভগবান একস্থানে পরিদর্শন করাইলেন। ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্তমান ত্রিকালের সমস্ত ঘটনা ভগবৎ সত্তায় বিদ্যমান রহিয়াছে।

ভগবানের নিকট আশ্বাস পাওয়ার পরও দিব্যচক্ষুতে ভগবানের উগ্রমূর্তি পরিদর্শনে অর্জুনের মনে ভীতির সঞ্চার হইয়াছে। তাই তিনি নিবেদন করিতেছেন, 'আখ্যাহি মে কো ভবানুগ্ররূপো' তাহার এবম্বিধ কাতরতায় ভগবান বলিতেছেন,

কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো
লোকান্ সমাহর্তুমিহ প্রবৃত্তঃ।
ঋতেঽপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সর্বে
যেঽবস্থিতা প্রত্যনীকেষু যোধাঃ। ১১।৩২

ভগবান্ তাঁহার অলৌকিক তত্ত্ব অর্জুনকে বুঝাইতে প্রবৃত্ত হইয়া বলিতেছেন যে তিনি লোকক্ষয়কারী সাক্ষাৎ

কাল-স্বরূপ। দুর্যোধনাদিকে সংহার করিতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। অর্জুন যুদ্ধ না করিতে ইচ্ছা করিলেও প্রতিপক্ষীয় যোদ্ধাগণের কেহই জীবিত থাকিবেন না। দুর্যোধনাদি দুষ্টের দমন, যুধিষ্ঠিরাদি শিষ্টের পালন ও ভারতের সনাতন ধর্মের রক্ষার জন্যই ভগবান শ্রীকৃষ্ণাবতারে দেহধারীরূপে সংসারে আবির্ভূত হইয়াছেন। অর্জুনের মোহজাল সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত না হওয়াতে ভগবানের স্বরূপ দর্শনেও তাহার প্রতীতি হইতেছে না। তাই তিনি কে এবং কিসের নিমিত্ত ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন, জানিতে চাহিয়াছেন এবং ভগবানও তাহার জবাব দিয়াছেন। যুগে যুগে ভগবানের সংসারে বিভিন্ন অবতাররূপে যে পরিক্রমা, আর তাহা যে অজ্ঞানী জীবগণের অগম্য ও অবোধ্য ইহাই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার বাণীতে পরিস্ফুট করিয়া বলিলেন।

ভক্ত আপনার হৃদয়রঞ্জনকে আপন মনের মাধুরীতে পরিবেষ্টিত মনোমোহন মূর্ত্তিতেই দেখিতে ভালবাসেন। তাই অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বিশ্বরূপে উপসংহার করতঃ ভক্তবৎসলরূপ ধারণ করিতে প্রার্থনা করিলেন।

মনুষ্য দ্বিভুজ বিশিষ্ট। শ্রীকৃষ্ণ মনুষ্য ছিলেন না। তিনি ভগবান্, 'কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং'। সুতরাং মানবাকারের সহিত তাঁহার বিভিন্নতা হওয়া স্বাভাবিক। তিনি দ্বিভুজ মানববিগ্রহধারী হইলেও শিশুপালকে, মা যশোদাকে ও উদ্ধবকে, তাঁহার অলৌকিক রূপ দর্শন করাইয়াছিলেন। বিশেষতঃ বসুদেব নিবাসে শঙ্খচক্রগদাধারী চতুর্ভুজ রূপেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন। অর্জুন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে দ্বিভুজ দেখিলেও, চতুর্ভুজ বিষ্ণু বলিয়া জানিতেন, ইহাই তাঁহার ইষ্টমূর্ত্তি। তাই অর্জুন বলিতেছেন ;

কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্ত-
মিচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্টুমহং তথৈব।
তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন
সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্ত্তে। ১১।৪৬

ভগবানের যে যেন মূর্ত্তিই সাধক দর্শন করেন না কেন, তাহাতে তাঁহার ইষ্টমূর্ত্তিই দৃষ্ট হইয়া থাকে। অন্তর্যামীর প্রেরণায় সাধক ভগবানের নানারূপে এক নিজ ইষ্ট মূর্ত্তিকেই দর্শন করেন। অর্জুনের তাহাই ঘটিয়াছিল। তবে ভগবানের 'অনন্তবাহুরবিচন্দ্রনেত্রম্' স্বরূপ দর্শন অর্জুনের পক্ষে দুর্নিরীক্ষ্য হইয়াছিল, তাই তিনি ইষ্টদেবের হাত বিকশিত শান্তসৌম্য মূর্ত্তি দর্শনের আকাঙ্খা করিয়াছেন :

'অনন্তবাহুরবিচন্দ্রনেত্র' আদি শ্লোকে ইহা বুঝাইতেছে ভগবানের বিরাট বিগ্রহে অর্জুন অসংখ্য বাহু, অসংখ্য উদর, অসংখ্য মুখমণ্ডল, অসংখ্য নেত্রাদি দর্শন করিতেছিলেন। শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে, তিনিই ব্যষ্টি ও সমষ্টিরূপে সর্ব্বথা বিরাজ করিয়া থাকেন তিনিই সমস্ত, সমস্তই তিনি। তারপর তিনি শিষ্যকে বলিতেছেন

ময়া প্রসন্নেন তবার্জুনেদং
রূপং পরং দর্শিতমাত্মযোগাৎ।
তেজোময়ং বিশ্বমনন্তমাদ্যং
যন্মে ত্বদন্যেন ন দৃষ্টপূর্ব্বম্। ১১।৪৭
সুদুর্দ্দর্শমিদং রূপং দৃষ্টবানসি যন্মম।
দেবা অপ্যস্য রূপস্য নিত্যং দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ।
১১।৫২

অন্বয়ার্থ :—হে অর্জুন, তোমার প্রতি আমি প্রসন্ন হইয়াই আমি আত্মযোগে স্বতঃ তোমাকে এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তেজোময় অনন্ত আদ্যরূপ প্রদর্শন করাইলাম; তোমার পূর্ব্বে এইরূপ অপর কেহ দর্শন করে নাই। ৪৭

আমার এই বিশ্বরূপ যাহা তুমি দর্শন করিলে, তাহা দর্শন করা অতি কঠিন। দেবগণও এইরূপ সর্ব্বদা দর্শন করিবার আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন। ৫২

এবম্প্রকারে ভগবান সৌম্যমূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক অর্জুনরূপী শিষ্যকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন—'যিনি সর্ব্বভূতে বৈরভাবশূন্য, সর্ব্ববিষয়ে আসক্তিশূন্য হইয়া, অনন্যভাবে আমাকে আশ্রয় করিয়া, সর্ব্বতোভাবে আমার ভজনা করেন এবং নিষ্কামভাবে আমারই কর্ম্মবোধে যথাপ্রাপ্তনিয়তকর্ম্ম সম্পাদন করেন, আমার ঈদৃশভক্তগণ আমাকেই প্রাপ্ত হন।

শ্রীকৃষ্ণ ভগবান শিষ্য অর্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া অন্তেবাসীর অন্তঃকরণে তাঁহার উদাত্ত বাণীতে যে আশ্বাসদান করিতেছেন তাহা এই :

যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্ ॥
১২।৬।৭

নিত্য নৈমিত্তিক ও আত্যন্তিক—তাবৎ কর্ম্মই যাহারা ভগবান বাসুদেবে ন্যস্ত করিয়া, ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহারই হয়েন; সুখে দুঃখে সম্পদে বিপদে সর্ব্বথা ভগবানই শরণাগত যাহাদের অবলম্বন, ভগবানকে ভুলিয়া ক্ষণার্দ্ধকাল যাহারা জীবিত থাকা বিড়ম্বনা মনে করেন: ঈদৃশ সাধকগণ নানাতরণভূষিত, শ্বেত কৃষ্ণ নীলাদিবর্ণযুক্ত, দ্বিভুজ বা চতুর্ভুজ, স্ত্রী বা পুরুষ যেরূপেই তাঁহাদের অভিরুচি হউক, ভগবানের অর্চ্চনা করেন; এবং উপাস্যরূপের চিত্তের সমাধি হইলে, ভগবান স্বয়ং কর্ণধার হইয়া নিজ পাদাম্বুজরূপ পোতে, মৃত্যুময়, অজ্ঞানময় সংসারসমুদ্র হইতে তাঁহার ভক্তগণকে—উপাসকগণকে অচিরেই উদ্ধার করিয়া থাকেন।

[ঃ দ্রঃ—আলোচ্য প্রবন্ধে পরমভাগবত শ্রীশ্রীসদ্গুরুদাসজী কাঠিয়া বাবাজী মহারাজকৃত গুরুশিষ্য-সংবাদ গ্রন্থ ছাড়াও গীতার বিভিন্ন ভাষ্যকারকৃত গ্রন্থ হইতে সাহায্য নেওয়া হইয়াছে। প্রবন্ধকার তাঁহাদের নিকট ভক্তিপূর্ণচিত্তে কৃতজ্ঞতা জানাইতেছেন।]

শিলচর কাঠিয়াবাবার আশ্রমে যুগলবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা

শ্রীদেবেন্দ্র কুমার পালচৌধুরী

পরমারাধ্য ব্রহ্মর্ষি শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজের শুভ আবির্ভাব ও তৎকালে পূর্ব ও মধ্যভারতব্যাপি যে ভাগবত আন্দোলন সুরু হয়েছে, তারই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা দেখতে পাই আসাম, বাংলা ও উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ স্থানে 'কাঠিয়াবাবার আশ্রমের' দ্রুত সম্প্রসারণ। বসন্তের আন্দোলনের ফলে বৃক্ষের শাখাপ্রশাখায় যেমন পত্রপুষ্পের স্বাভাবিক উদ্গম হয়ে থাকে, চেষ্টার কোন প্রয়োজন হয় না, তেমনি শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজের ভাগবত আন্দোলনের পরিণতিতে এবম্বিধ আশ্রমসমূহের স্বতঃস্ফূর্ত উদ্ভব। বর্ত্তমানকালে জাতীয় ধর্মভাব জাগরণের মূলে বাবাজী মহারাজের অবদান কতখানি সেটার পরিমাপের সময় এখনও আসেনি যেমন করে শুদ্ধ নানকের আবির্ভাবের ফলে উত্তর পশ্চিম ভারতে ঘটেছিল জাতীয় ধর্মভাব ও ঐক্যবোধের উন্মেষ, যেমন করে দাক্ষিণাত্যে রামানুজাচার্য্যের ভাগবত আন্দোলনের ফলস্বরূপ হয়েছিল বৈষ্ণব ধর্ম্মের উপস্থাপন, অথচ তাঁদের সমসাময়িক কালে এসব উদ্ঘোষের পরিমাপের কোন অবকাশ হয় নি, বাবাজী মহারাজের জাতীয় ধর্মভাব সম্প্রসারণের মূলে তাঁর অবদান কতটুকু এখনই সেটা নির্ণয় হওয়া কঠিন। দেখা যায় এসব আন্দোলনের ঐতিহাসিক গবেষণা চলতে থাকে আচার্যগণের তিরোধানের পরবর্ত্তী সময়ে। বর্ত্তমান যুগে জাতীয় ধর্মান্দোলন উন্মেষের মূলে বাবাজী মহারাজের অবদানের ঐতিহাসিক গবেষণাও কালসাপেক্ষ। সমসাময়িককালে এর মূল্য নিরূপণ হওয়া সম্ভব নয়।

শ্রীভগবান্ পরম মঙ্গলময়। শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজের শ্রীবৃন্দাবনের নিভৃত আশ্রম ত্যাগ ও উত্তরাখণ্ডে গমন, তৎকালে সেটা যত বড় বেদনাদায়ক ঘটনারই অবতারণা হয়ে থাকুক না কেন, তার পশ্চাতে যে ছিল শ্রীভগবানের পরম আশীর্ব্বাদ, সেটা তখন কে জানত? আজ যেভাবে জাতীয় ভাগবত আন্দোলনের পুরভাগে বাবাজী মহারাজকে আমরা দেখতে পাই, সেভাবে তাঁকে পাওয়া যেত কিনা সন্দেহ। বাবাজী মহারাজের সর্বপ্রথম ভাগবত আন্দোলন ও তৎফলে শিলচরস্থ বিলপার নামক স্থানে প্রথম আশ্রম নির্ম্মাণের জমি সংগ্রহের ইতিবৃত্ত অবগত

হওয়া যায় তদীয় গ্রন্থ 'শরণাগত বৎসল শ্রীভগবান্' নামক গ্রন্থ পাঠে। কিন্তু সেই আশ্রমটির নির্মাণকার্য সমাপ্ত হয় সর্বশেষে তাঁর অপরাপর আশ্রম নির্মাণেরও অনেক পরে। ভক্তজন মাত্রই শ্রীভগবানের পূর্ণাঙ্গ শ্রীবিগ্রহ পূজা ও তাঁর নিত্যদর্শনলাভ আকাঙ্ক্ষা করে থাকেন। শিলচর শাখাটিও 'বাবার আশ্রমে' এতকাল শ্রীবিগ্রহের সেই অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছিল। দীর্ঘকাল শ্রীশ্রীরাধাবিহারীজীউর ফটো, গোপালজী প্রতিষ্ঠা ও শালগ্রামজীর পূজন, ভোগরাগ ও আরতির মাধ্যমে সে অভাব পূরণের চেষ্টা করা হয়েছিল বটে; কিন্তু সেটা ভক্তচিত্তগণের মনস্কামনায় পরিপূরক ছিল না। সম্প্রতিকালের চলতি বৎসরের ২৭শে ফাল্গুন যুগলবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করে সে অভাব দূরীভূত করা সম্ভব হল। প্রতিষ্ঠা দিবসে ভক্তজনের প্রার্থনায় বাবাজী মহারাজ যে ভাষণ প্রদান করেছিলেন তৎশ্রবণে অবগত হওয়া যায় যে বিগ্রহযুগল প্রতিষ্ঠার মূলে তদীয় একান্ত সেবক রাধাকৃষ্ণদাসজীর আগ্রহ ছিল সর্বাধিক। বাবাজী মহারাজ তদীয় ভাষণে সহর্ষে বলেন 'এবার ঠাকুরজী এসেছেন রাধাকৃষ্ণদাসের ঘাড়ে চেপে'।

আসামপ্রদেশে এবৎসর ফাল্গুনের শেষার্ধ থেকেই বর্ষা সুরু হয়েগিয়েছিল। ঝড়, শিলাবৃষ্টি প্রভৃতির দৌরাত্ম্য একরূপ নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা বললেই ঠিক হয়। প্রতিষ্ঠার পূর্ব দিবসটিও বৃষ্টিবাদলেরই ইতিহাস। প্রবন্ধ লেখক প্রতিষ্ঠার পূর্ব দিবসে আশ্রমে অনুপস্থিত ছিলেন। পরদিবস তিনি অবগত হন ২৬শে ফাল্গুন সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় যুগলবিগ্রহ ও শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজকে নিয়ে বাদ্যবাদ্য সহ এক বিরাট শোভাযাত্রা। যখন সমগ্র শহর পরিক্রমায় বাহির হয় তখন আকাশ ছিল মেদুর, গুরুগুরু মেঘ গর্জনে শোভাযাত্রা ছিল মন্থর, ছিল সন্ত্রস্ত কি জানি কখন বর্ষা সুরু হয়। শোভাযাত্রার প্রধান, উদ্যোক্তা ছিলেন গুরু ভ্রাতা বীরেশ্বর ভট্টাচার্য মহাশয় তিনি এবং তাঁর মত অনেকেরই প্রত্যয় ছিল দৃঢ়—বাবাজী মহারাজ নিশ্চয়ই কোন অঘটন ঘটতে দিবেন না। শেষ পর্যন্ত হলও তাই। প্রায় ঘন্টা চারেক সময় যতক্ষণ শোভাযাত্রা শহর প্রদক্ষিণ করছিল একফোঁটা বৃষ্টিও পড়েনি তখন। শহরের অলি-গলিতে রাজপথে হর্ষধ্বনি করতে থাকে। বাবাজী মহারাজ ও যুগল বিগ্রহের দর্শন লালসায় ভীড় জমাতে থাকে। শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীশ্রীরাধাবৃন্দাবনেশ্বরীজীউর প্রতিষ্ঠাকালে যুগলবিগ্রহ নিয়ে যে ঐতিহ্যমণ্ডিত শোভাযাত্রা ধাম পরিক্রমা করেছিল, সেই শোভাযাত্রার আমিও ছিলাম উপস্থিত। বাচকের উদ্দীপনাময় বক্তৃতার মধ্যে আমি যেন সেই শোভাযাত্রা গমনই প্রত্যক্ষ করতে লাগলাম। যাই হ'ক পরিক্রমা সমাপ্ত হয় রাত্রি ১০ টায়। শ্রীশ্রীরাধাবিহারীজীউ আশ্রমে পৌঁছে মন্দিরে প্রবিষ্ট হয়েছেন যেই অমনি মুষলধারায় বর্ষণ সুরু হলো। এ বর্ষণ অবশিষ্ট রাত্রি পর্যন্ত একটানা চলতে থাকে। বিদেশাগত যারা আসামে এসে এতদ্দেশের বর্ষা প্রত্যক্ষ করে গেছেন, তারা অবশ্যই এর সত্যতা উপলব্ধি করতে পারবেন। এবম্বিধ অলৌকিক ঘটনায় সকলে ভক্তি ও শ্রদ্ধায় একেবারে আপ্লুত হয়ে পড়েন।

২৭শে ফাল্গুন প্রতিষ্ঠার শুভদিনে আকাশ একেবারে নির্মেঘ। রবিরশ্মি বিচ্ছুরিত হয়ে জনমানসে এক অপূর্ব আনন্দ বিকীরণ করতে লাগল। ইহা একেবারেই অপ্রত্যাশিত, তাই অলৌকিক বলে মনে হতে লাগল। আশ্রমে কি অপূর্ব উৎসবসজ্জা। কদলীবৃক্ষ, মঙ্গলঘট, আম্রপল্লব ও বিচিত্র রঙের পতাকায় কি অপরূপই না দেখাচ্ছিল তাকে। ফটকের প্রবেশ পথেই প্রকাণ্ড যজ্ঞশালা। অধিকগণ বিচিত্র পরিধেয় ধারণ করে একান্ত ধ্যানে নিমগ্ন থেকে বৈদিক মন্ত্র পাঠে রতছেন হবন। তৎপর মন্দির। কক্ষদ্বার মন্দিরে হচ্ছে বিগ্রহযুগলের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা, শৃঙ্গার, ভোগরাগ। আর নাটমন্দিরে এক সুসজ্জিত আসনে সমাসীন শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজ, হচ্ছে গুরুপূজা। পূজায় বসেছেন শ্রীবীরেশ্বর ভট্টাচার্য আর ঋত্বিমণ্ডল কলেজের প্রাক্তন বর্তমান অধ্যক্ষ শ্রীপ্রবেশ ভট্টাচার্য মুহুর্মুহু করছেন বেদমন্ত্র উচ্চারণ, আর সকলেই সেটা আবৃত্তি করছে সাথে সাথে। নাটমন্দিরে আর লোক ধরে না। গুরুপূজা সমাপ্ত হল 'ভব সাগর তারণ কারণ হে' গুরুবন্দনাটি গেয়ে। অবশেষে বাবাজী মহারাজের শুভ উপস্থিতিতে যজ্ঞশালায় হোমকুণ্ডে ঋত্বিকগণ পূর্ণাহুতি

প্রদান করলেন শঙ্খ, দুন্দুভি ও বাদ্যযন্ত্রধ্বনিতে যজ্ঞশালা নিনাদিত হতে লাগল। অতঃপর মন্দিরদ্বার উন্মোচন করা হল। পূজার বেশে সুসজ্জিত শ্রীশ্রীরাধা-বৃন্দাবনবিহারী মন্দির সম্পূর্ণ ও আলোকিত করে ভক্ত জনমানসে কি অপূর্ব আন্দোলন ও আনন্দই না দান করতে লাগলেন। সহস্র সহস্র কণ্ঠের আরতি স্তোত্র যেন সমগ্র-আশ্রমে ঢেউ খেলতে লাগল। শঙ্খধ্বনি চতুর্দিকে জনসমুদ্রে ছিটিয়ে দেওয়া হল।

শুভব্রাতা শ্রীবিজয় রায়চৌধুরী মাইকের সাহায্যে প্রতিষ্ঠা দিবসের কার্যসূচী ঘোষণা করছিলেন। এখন প্রসাদ বিতরণ। প্রথম পঙ্‌ক্তিতেই প্রায় হাজার পাঁচেক স্ত্রীপুরুষ বসে গেল প্রসাদ পেতে। ভিতরের উঠান, নাট মন্দির বহির্প্রাঙ্গণে তিল ধারণের আর স্থান নাই সন্ধ্যা ৬ ঘটিকা পর্যন্ত চলল একটানা প্রসাদ বিতরণ।

একটি জনসভার আয়োজন করা হয়েছিল। কার্যসূচী পরিক্রমা অনুযায়ী রাত্রি ৮ ঘটিকায় শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজ সভায় পদার্পণ করলেন ভাষণ দিতে প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে বাবাজী মহারাজের লিখিত 'শিলচর ভাটিয়া বাবার আশ্রম ও তাহাতে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্ত' ভাষণটি ক্ষুদ্র পুস্তিকাকারে ছাপা হয়ে ইতিমধ্যেই বিনামূল্যে সাধারণে প্রচার করা হয়েছিল। বাবাজী মহারাজ বললেন, আসাম প্রদেশে শ্রীনিম্বার্ক সম্প্রদায়ের এইটিই একমাত্র আশ্রম। আশা করা যায় আসাম প্রদেশের সকলে এই আশ্রমে এসে বিগ্রহ দর্শন করতঃ শান্তিলাভ করতে পারবে।

শিলচর ভাটিয়াবাবার আশ্রমে একটি জনহিতকর প্রতিষ্ঠান রয়েছে। সেটি হচ্ছে শ্রীশ্রীরামদাস ভাটিয়াবাবা সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়। বহু ছাত্রছাত্রী এই মহাবিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করছে। সম্পাদক শ্রীনেপাল দাস সর্বসাধারণের অবগতির জন্য নাতিদীর্ঘ ভাষণ দ্বারা এর সম্পূর্ণ আলেখ্যটি উৎসব সভায় সুষ্ঠুভাবে তুলে ধরলেন। সভার কার্য সমাপ্ত হয় বাবাজী মহারাজ কর্তৃক হরির লুট প্রদানের পর।

শিলচর ভাটিয়াবাবার আশ্রমে বিগ্রহযুগল প্রতিষ্ঠার কার্য সুসম্পন্ন হল। প্রতিষ্ঠা দিবসের একটি অলৌকিক ঘটনা সেটি না বললে নয়। পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে আশ্রমে এবার ফাল্গুনের শেষার্ধ থেকেই বর্ষা সুরু হয়েছে। প্রতিষ্ঠা দিবসের পূর্বরাত্রে যেভাবে বর্ষণ হচ্ছিল তাতে সকলেরই আশঙ্কা ছিল উৎসব দিবসটি একেবারেই মাটি হয়ে যাবে। কিন্তু শ্রীশ্রীবৃন্দাবনবিহারীর এমনি কৃপা যে রাত্রি প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে নির্মেঘ আকাশে অকস্মাৎ কনক আলো ফুটে উঠল। সমগ্র দিবসটি রৌদ্রস্নাত ও ছিলই পরন্তু শুক্লা দশমীর চন্দ্রকিরণে সন্ধ্যাকাশটিও ছিল জ্যোৎস্না-স্নাত। তখন কেহই ভাবতে পারে নি রাত্রিকালে বৃষ্টি হতে পারে। তখন প্রতিষ্ঠার কোন কার্যই অবশিষ্ট ছিল না। পৌরভবনে সবে আলো নিভেছে। শ্রান্তদেহে সকলেই নিয়েছে শয্যার আশ্রয়। তৎক্ষণাৎই সুরু হল মুষলধারায় শিলাবৃষ্টি ও বর্ষণ। সে কি তাণ্ডবলীলা! আশ্রমের সন্নিকটেই ঢেউটিন নির্মিত জনৈক ধনাঢ্য ভদ্রলোকের গৃহে নৈশ শয্যায় নিদ্রিত ছিলাম। শিলাপাতের শব্দে অকস্মাৎ নিদ্রা ভেঙ্গে গেল। সেই গৃহের চালে শিলাবৃষ্টির যে তুমুল শব্দ উত্থিত হয়েছিল তাতে কর্ণকুহর বধির হবার উপক্রম হয়েছিল। ভাববার বিষয় এবম্বিধ শিলাপাত ও বায়ুবর্ষণের উৎপাত দিবাভাগে সংঘটিত হলে প্রতিষ্ঠা ও উৎসবের কার্য কি পরিমাণ যে ব্যাহত হ'ত সেটা ধারণাও করা যায় না। শরণাগত বৎসল ভগবান ভক্তের কাছে তাঁর নামটি কিছুতেই কলঙ্কলিপ্ত হতে দেন না। তাই তৎকর্তৃক উৎসবে সমাগত ভক্তজনের ক্লেশ নিবারণ, দিবসব্যাপি উৎসবে আনন্দদান এবং নৈশশয্যায় তাদের স্বস্তি অপনোদনে তাঁরই অপার করুণা ও ভক্তবাৎসল্যের পরিচয় সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।

একটি স্মৃতিচারণ

শ্রীমতী আলো মুখার্জি

পূজনীয়া শ্রীগঙ্গাদেবীর কাছে মুখচরে এই ঘটনাটি শুনেছিলাম, ঠিক যেভাবে শুনেছিলাম সেইভাবেই ঘটনাটি লিখতে চেষ্টা করছি।

'আমার শ্রীগুরুদেব (শ্রী:০৮ স্বামী সচ্চিদানন্দ বাবাজী মহারাজ) আমাদের সাথে নিয়ে সমস্তিপুরে যান, সেখানে তিনি কয়েকদিন অবস্থান করেন। তিনি তখন শ্রীবৃন্দাবনের ব্রজবিদেহী মহন্ত এবং বৈষ্ণব চতুঃসম্প্রদায়ের শ্রীমহন্ত। সেইজন্য সাধুসমাজে তাঁর খুব নামডাক থাকায় বহুলোক প্রতিদিন তাঁকে দর্শন করতে আসত। দর্শনার্থীদের বহু প্রশ্নের উত্তর তিনি মৃদু হাসিমাখা মুখে দিতেন। কথা বলতেন খুবই কম। কিন্তু মুখে সবসময় একটা মধুর সরল ভাব বিরাজ করত।

দ্বিতীয় দিনে সমস্তিপুরের জমিদার তার একমাত্র পুত্রকে নিয়ে শ্রীগুরুদেবের কাছে এসে ছেলেটিকে তাঁর পায়ের কাছে শুইয়ে দিল। ছেলেটির বয়স দশ বছর, কিন্তু সে স্বাভাবিক নয়। ছোট শিশুর মতই সে রয়ে গেছে। একটুও বাড়েনি। কিছু খেতেও পারছে না, যা খায় তাই আবার মুখ দিয়ে উঠে আসে। জমিদার বাবুরা ছয় ভাই কোন ভাইয়েরই কোন সন্তান হয় নি। এই সন্তানটি বিপুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী। জমিদার হাত জোড় করে কাঁদতে কাঁদতে বলল 'বাবা আমাদের এই একমাত্র ছেলেকে আপনি কৃপা করে বাঁচিয়ে দিন। এই ছেলেটি ছাড়া আমাদের আর দ্বিতীয় কোন বংশধর নেই। এ না বাঁচলে আমাদের বংশ থাকবে না।'

শ্রীগুরুদেব কিছু সময় চুপ করে রইলেন—তারপর জমিদারকে উদ্দেশ করে বল্লেন, 'বাবা, আমি একজন সাধু তোমার ছেলেকে ডাক্তার দেখাও। আমি তো কোন ওষুধ বা মাদুলি দেই না।' তখন জমিদার বলল, 'বাবা, একে আমি অনেক বড় বড় ডাক্তার দেখিয়েছি কিন্তু কোন ফল হয়নি দশ বছরের এই ছেলে শিশু হয়েই রয়েছে—এখনও বসতে বা কথা বলতে পারে না, কিছু খেতেও পারে না। এর জন্য আমরা অনেক টাকা খরচ করেছি কিন্তু কোন ফল হয় নি। ভগবান ভরসা করে আপনার কাছে এনেছি। ভাল করে দিতেই হবে। আপনি হয় একে ভাল করে দিন, নয়ত একে মেরে ফেলুন। তিলে তিলে এই যন্ত্রণা আর সহ্য করতে পারি না।'

শ্রীগুরুদেব কিছুক্ষণ শিশুটির মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর কিছুটা গম্ভীর হয়ে জমিদারকে বল্লেন, 'যা বলি তা করতে পারবে তো?' জমিদার হাত জোড় করে জানাল যে সাধ্য ও সম্ভব মত সব কিছু করতে প্রস্তুত।

শ্রীগুরুদেব বড়ই করুণা মাখা স্বরে বল্লেন, 'বাবা প্রচুর পরিমাণে ঘুব ভাল ভাল খাদ্য দ্রব্য দিয়ে তোমাকে প্রায় পনের হাজার লোক খাওয়াতে হবে। একদিন দুইশ'র বেশী লোক খাওয়াবে না। এইভাবে প্রতিদিন দু'শ লোককে আহার করিয়ে যেতে হবে, যতদিন না পনের হাজার লোক খাওয়ান হচ্ছে। ভোজ্য প্রস্তুত হলে এই ছেলেকে কোলে করে এর দুই হাত দিয়ে প্রতিদিন সেইসব ভোজ্য বস্তু স্পর্শ করাবে। যখন লোকে খেতে বসবে তখন সামনে তোমার ছেলেকে শুইয়ে দেবে। যতদিন লোক খাবে ততদিন এই নিয়ম চলতে থাকবে এর ব্যতিক্রম যেন কখনও না হয়।

জমিদার গুরুদেবকে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ প্রণাম করে ছেলেকে তুলে নিয়ে চলে গেল। শ্রীগুরুদেব কয়েক দিনের মধ্যে সমস্তিপুর ত্যাগ করলেন। জমিদার শ্রীগুরুদেবের নির্দেশ মত প্রতিদিন ঐভাবে দু'শ করে লোক খাওয়ান ও ছেলেকে দিয়ে যা করাবার কথা সেই সব কাজ শুরু করে দিল।

কয়েকদিনের মধ্যে ছেলের দেহে প্রাণচাঞ্চল্য দেখা দিতে লাগল। ছেলে একটু একটু করে খেতে লাগল। এবার আর খাদ্য দ্রব্য উঠে আসত না। এরপর যতই দিন যেতে লাগল ততই ছেলেটি স্বাভাবিক হতে লাগল। ধীরে ধীরে বলতে ও কথা বলতে শিখল। যেদিন গ্রামের হাজার লোক খাওয়ান শেষ হল, সেদিন দেখা গেল ছেলেটি আর পাঁচটী ছেলের মতই হেঁটে বেড়াচ্ছে। ছেলে ভাল হয়ে গেল। জমিদার পরিবারের উত্তরাধিকারী সুনিশ্চিত হল।

এরপর, সাধুজী কোন মাদুলী বা ওষুধ না দিয়ে ছেলেকে কেমনে ভাল করে দিলেন, এর রহস্যটা কি তা জানার জন্যে জমিদার পরিবারের সকলের কৌতূহল হল। তখন জমিদার এই বিষয়টি জানতে শ্রীগুরুদেবকে একটি পত্র লেখেন।

শ্রীগুরুদেব পত্রের উত্তরে লিখেছিলেন 'তোমার ছেলে পূর্বজন্মে বহু ধন সঞ্চয় করেছিল সেইজন্য এই জন্মে সে বিপুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়ে জন্মেছে। কিন্তু গত জন্মে সে নিজের হাতে কাউকে খাওয়ায়নি। এই না খাওয়ানর ফলে এ জন্মে সে কিছু খেতে পারছিল না, ফলে তার শরীরও বাড়ছিল না। তুমি যে এত লোককে খাইয়েছ, তাতে তার পূর্ব জন্মের নিজ হাতে না খাওয়ানর পাপ খণ্ডন হয়ে গেছে তাছাড়া উত্তম উত্তম দ্রব্য খেয়ে লোকেরা তোমার ছেলেকে আশীর্বাদও করেছে, তারই ফলে তোমার ছেলে ভাল হয়ে গেল।"

এই বলে শ্রীসদাদেবী নীরব হলেন।

বাঁশী বাজে

শ্রীকিঙ্কর শ্যামানন্দ

নিজনে বিজনে শয়নে স্বপনে
মধু গুঞ্জনে বাঁশী বাজে
বাঁধন টুটানো বাঁশরীর সুরে
সাজে মনপ্রাণ নব সাজে—
বাঁশী বাজে ?
ও সুর শ্রবণে মন ভেসে যায়,
গৃহ কাজ মোর সকলই ভুলায়,
বুঝি না কি করি সদাই কাঁদায়ে
ডুবায় আমারে সুর মাঝে
বাঁশী বাজে !
বয়ে যায় বেলা ধূলা গৃহকাজে
জলকে চলিতে যায় কোন সাঁঝে
প্রাণ গোপীজন নয়নে অঞ্জন
চলে অভিসারে নব সাজে –
বাঁশী বাজে !
দ্যুলোক ভূলোকে বেণু সুর লোকে,
সাথে মিশামিশি আলোকে পুলকে,
চল মন সুখে সেই রব লোকে
গোলক বিহারী বেণু বাজে—
বাঁশী বাজে !
মধু অভিলাষী এ মন ভ্রমর
ও পদপঙ্কজে যেন রহে তোর
কোথা তুমি প্রিয় অমর অমিয়
লুটাও আমারে পদতলে
বাঁশী বাজে
বাজে গো বাঁশরী মধু ব্রজে
ছুটি যাবে !

শ্রীশ্রীগীতা ও আমি

শ্রীমতী রমিতা গোস্বামী

'শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্'
তোমার চরণে লীন আমার "অহং"।

২ 'পশ্যামি ত্বাং দর্শনসংমুদ্রচেতাঃ'
নিরাস হৃদয়ে তাই অবলম্বি গীতা।

৩ 'কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ'
দুর্লভ ভকতি আমি কোথা, কবে পাব?

৪ 'যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে'
বধির শ্রবণে হায়, পশিবে কেমনে?

৫ 'যদ্যদাং অমনাময়ন্তে'
আসিয়াছি তব পদ প্রান্তে।

৬ 'ন মহাত্মা সুদুর্লভঃ'
তুমি ত দুর্লভ, তবু কৃপা পেনু তব।

৭ 'যাদৃশীং তদ্বয়াশ্রিতম্'
নিলে পায়ে গুরুজনে, এই কৃপা কর।

৮ 'নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা'
হব গো কেমনে আমি, এ সংসার বন্ধা?

৯ 'ত্যক্ত্যা মামভিজানাতি'
আমি ত নহিক ভক্ত, অতি দুরমতি

'যাবান যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ'
তব তত্ত্ব নাহি জানি হে প্রভু অচ্যুত।

'স্বরূপণা তমতর্ক্যা' তাই ঘটে হয়,
সংসারেতে বদ্ধ বলে কেন তবে তত্ত্ব?

'তেষাং সততযুক্তানাং'
আমি ত তেমন যুক্ত কভু না হলাম!

১৩ 'যা নিশা সর্বভূতানাং'
তোমার সবধে সেই নিশা ঘনাইল।

১৪ 'সম্ভবামি যুগে যুগে'
দুর্দিনের আবাসে বাণী তব শ্রীমুখে

১৫ 'ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি'
কেন তবে বিরূপ হইলে মোর প্রতি?

১৬ 'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ'
তবু তুমি নানা তীর্থে খুঁজি পরমজ।

'যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ'
সেই লাভ তবে নাহি যাহা মোর চিত।

'নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি'
কেন তবে দুঃখ পাই নাহি করি ভক্তি?

শিলচরে শ্রীশ্রীরামদাস কাঠিয়া বাবা সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়

শিলচর হইতে শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ পুরকায়স্থ জানাইয়াছেন যে, শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজ গত ১৮ই মার্চ, ১৯৭৬ উপরোক্ত মহাবিদ্যালয়ের গৃহ নির্মাণের জন্য ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন। এই বিষয়ে স্থানীয় পত্রিকা 'দৈনিক প্রাগ্‌জ্যোতি'তে ১৯শে ও ২০শে মার্চ যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"শ্রীশ্রীরামদাস কাঠিয়া বাবা সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ের ভিত্তিস্থাপন—সংস্কৃত ভাষা শিক্ষাপ্রসারে সকলকে সচেষ্ট হতে আহ্বান।—আজ (অর্থাৎ ১৮ই মার্চ) সকালে বিলপার কাঠিয়াবাবার আশ্রম সংলগ্ন নিজস্ব ভূমিতে শ্রীশ্রীরামদাস কাঠিয়া বাবা সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ের ভিত্তি স্থাপন করেন শ্রী১০৮ স্বামী ঘনশ্যামদাসজী কাঠিয়া বাবা ব্রজবিদেহী

মহন্ত মহারাজ। মন্ত্রী শ্রীসুরেন নন্দী, জেলা উপাধ্যক্ষ শ্রীযি হাজারিকা ও শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

স্বামী ধনঞ্জয়দাসজী কাঠিয়া বাবা তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে বলেন,—"আমার গুরুদেব বলেছিলেন শ্রীশ্রীরামদাস কাঠিয়া বাবার নাম প্রচার করার জন্য। আমরা আজ তাঁরই নামে এই সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করে খুবই আনন্দ উপভোগ করছি।" তিনি বলেন—"সংস্কৃত ভাষার মধ্যেই নিহিত রয়েছে মানুষের জীবনের পরম গুঢ় তত্ত্ব মানুষ কিসে দেবদুর্লভ চরিত্রের অধিকারী হয়ে অমূল্য মানবজীবনকে সার্থক করে তুলতে পারে সেই শিক্ষা আমরা পাই সংস্কৃত গ্রন্থাদি পাঠে।" তিনি বলেন,—আমি কে, তুমি কে? আমরা দিনরাত শুধু বিষয়-আশয় নিয়ে আর আমি আমির মধ্যেই ডুবে আছি। বিশ্বজুড়ে বিশ্বস্রষ্টার যে অনিন্দ্য সুন্দর লীলা চলছে আমরা চোখ থেকেও অন্ধ, সেই অপরূপ লীলা দেখতে পাচ্ছি কোথায়? অজ্ঞানের অন্ধকারে সবাই ডুবে আছি, তাদের আলোর পথ দেখাবে সংস্কৃত অধ্যয়ন, আসুন আপনারা সবাই সংস্কৃত শিক্ষার প্রসারে সচেষ্ট হউন।"

জেলা উপাধ্যক্ষ শ্রীযি হাজারিকা মহাশয় এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাহায্যের জন্য তাঁর যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন। সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীদিগিন্দ্র আচার্য্য বেদান্ত শাস্ত্রী তাঁর নিবেদন পাঠ করেন, তাতে তিনি বলেন :—

"আজ হইতে প্রায় তিন বৎসর পূর্ব্বে ১৯৭৩ ইংরাজীর মার্চ্চমাসে, ব্রহ্মবিদ্বেষী মহন্ত ও চতুঃসম্প্রদায়ের শ্রীমহন্ত শ্রী ১০৮ স্বামী ধনঞ্জয়দাসজী কাঠিয়া বাবা তর্ক-তর্ক-ব্যাকরণতীর্থ মহারাজ ভ্রমণযোগে শিলচর আসেন। ঐ সময়ে একদিন কথাপ্রসঙ্গে এখানে একটি সংস্কৃত বিদ্যালয় স্থাপনের শুভেচ্ছা তিনি শ্রীমুখে ব্যক্ত করেন। এই শুভেচ্ছা-বাণী নিয়াই আশ্রমের ভক্ত শিষ্য সুধীগণের একান্ত আন্তরিক প্রচেষ্টায় জনসভা আহ্বান পূর্ব্বক একটি বিদ্যালয় কমিটি গঠন করা হয় এবং মহারাজজীর অনুমতিক্রমে ২৯-৪-৭৩ ইংরাজীতে এই আশ্রমে জ্ঞানীগুণীজন সমাবেশে মাননীয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জীবনকৃষ্ণ তর্কতীর্থ মহাশয়ের সভাপতিত্বে 'শ্রীশ্রীরামদাস কাঠিয়া বাবা সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়' নামে এই বিদ্যালয় শ্রী ১০৮ স্বামী ধনঞ্জয়দাসজী কাঠিয়া বাবা মহারাজ কর্তৃক এই কাঠিয়া বাবার আশ্রমে প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে বিদ্যালয় কমিটি প্রস্তাবাদি যথারীতি মাননীয় আসাম সংস্কৃত বোর্ড সম্পাদক মহোদয়ের নিকট পাঠাইয়া অনুমোদন চাহিলে ১৯৭০ ইং হইতে এই বিদ্যালয় বিভাগীয় অনুমোদন লাভ করে।

প্রথম বৎসর ১৯৭৩ ইংরাজীতে আমাদের বিদ্যালয় হইতে তিনজন ছাত্র আসাম সংস্কৃত সমিতির পরীক্ষা দিয়া তিনজনই সাফল্যের সহিত উত্তীর্ণ হয়। দ্বিতীয় বৎসর ১৯৭৪ ইংরাজীতে ঐ সংস্কৃত সমিতির পরীক্ষায় আমাদের বিদ্যালয়ের ১২ জন ছাত্রছাত্রী বিভিন্ন শাস্ত্রে পরীক্ষা দিয়া ১১ জন পাশ করে এবং তন্মধ্যে দুইজন মাসিক ১৫ টাকা হারে দুই বৎসরের জন্য কৃতিত্ব বৃত্তি লাভ করিয়াছে। তৃতীয় বৎসর ১৯৭৫ ইংরাজীতেও ঐরূপ বিভিন্ন শাস্ত্রে মোট ১৮ ছাত্রছাত্রী পরীক্ষা দিয়েছে, এদের সকলেরই পরীক্ষা ভাল হইয়াছে মনে হয়। অবশ্য ফল এখনও বাহির হয় নাই।

বর্ত্তমানে বিভিন্ন শ্রেণীতে কাব্য, ব্যাকরণ, জ্যোতিষ, কর্ম্মকাণ্ড, সাংখ্য ও বেদান্তদর্শন প্রভৃতি বিষয়ে সর্ব্বমোট ৬২ জন ছাত্রছাত্রী অধ্যয়নরত আছে। এই বিদ্যালয়ে অধ্যক্ষ ও একজন অধ্যাপক এবং একজন ইংরাজী ও মাতৃ-ভাষাদি শিক্ষক মোট তিনজন বিনা বেতনে তিনবৎসর যাবৎ যথারীতি অধ্যাপনা কার্য্য চালাইয়া আসিতেছেন। বিদ্যালয়ের কাজ আশ্রম গৃহেই চলিতেছে। বিদ্যালয় কমিটির সদস্যগণ কর্ত্তৃক সাহায্য এবং চাঁদা আদায়ের দ্বারা বিদ্যালয়ের খরচ এবং প্রয়োজনীয় ডেস্ক, বেঞ্চ, চেয়ার, টেবিল প্রভৃতি আসবাবপত্র ও লাইব্রেরির জন্য প্রায় এক হাজার টাকার পাঠ্য পুস্তক খরিদ করা হইয়াছে, তন্মধ্যে প্রায় অর্দ্ধেক সাহায্য মহারাজজী নিজ তহবিল হইতে দিয়াছেন।

আমাদের বিদ্যালয়ের গৃহাদি নির্ম্মাণের জন্য স্থানীয় রাধামাধবজীউ আখড়া ষ্টেটের পক্ষে সেবাইত শ্রীযুক্ত হৃষিকেশ সাহা মহাশয় সাগ্রহে ৪ বিঘা পরিমিত ভূমি বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন, যাহার উপর আজ ভিত্তিস্থাপন করা

হইল। আমাদের বিদ্যালয়ের দ্রুত উন্নতির পরিপ্রেক্ষিতে মাননীয় মহাসচিব আসাম সরকার বিগত ১৯৭৫ ইংরাজীতে বিদ্যালয়ের গৃহাদি নির্মাণ বাবদ দুই হাজার টাকা সাহায্য দিয়াছেন। বিদ্যালয়ের উক্ত জায়গাটি নিম্ন ছিল। প্রথমতঃ ঐ টাকার দ্বারা বহু মাটি আনাইয়া ভর্ত্তি করা হইয়াছে এবং সামান্য দেড়া প্রভৃতি বাবতে উক্ত টাকা সমস্ত খরচ করিয়া তাহার হিসাবও যথারীতি সরকারে দাখিল করা হয়েছে।

বর্ত্তমানে আর্থিক দিক দিয়া প্রায় নিঃস্ব অবস্থায় আজ এই বিদ্যালয়ের ভিত্তি স্থাপন করা হইল। আশাকরি মহাপ্রাণ ভারতের ঐতিহ্য ধারক ও বাহক সংস্কৃত ভাষার উন্নতিকল্পে এবং ধার্মিক ও চরিত্রবান্ ছাত্রগঠনে আমাদের প্রচেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের ও জিলাধিপতি মহোদয়ের এবং উপস্থিত সুধীবৃন্দের সর্ব্বতঃ সাহায্য সহানুভূতি ও প্রচেষ্টায় ছাত্রাবাসসহ গৃহাদি নির্মাণ এবং ত্বরান্বিত অবশ্যই হইবে ইহাই আমাদের নিবেদন।'

সভাশেষে উপস্থিত সকলকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।"

নিম্বার্ক ব্রতোৎসব নির্ণয়

ভ্রম সংশোধন

৩০শে বৈশাখ, ১৩ই মে, বৃহস্পতিবার, পূর্ণিমা রাত্রি ঘঃ ১।৪৪ পর্য্যন্ত। এই দিনই শ্রীশ্রীনৃসিংহচতুর্দ্দশী ব্রত হইবে। পূর্ব্বদিন ২৯শে বৈশাখ ত্রয়োদশী বিদ্ধা হওয়ায় ঐদিন ব্রত হইবে না।

৩০শে বৈশাখ, চন্দ্রগ্রহণ হইবে। গ্রহণ স্পর্শ—রাত্রি ঘঃ ১২।৪৫।৪২ সেঃ। গ্রহণ মোক্ষ—রাত্রি ঘঃ ২।২।৪৭ সেঃ। গ্রহণ স্থিতিকাল—ঘঃ ১।১৭।১৫ সেঃ।

সন ১৩৮০ বাংলা, জ্যৈষ্ঠ মাস—৩১ দিন

৪ই জ্যৈষ্ঠ, ১৯শে মে, বুধবার, কৃষ্ণা ষষ্ঠী, শ্রীবাসন ভট্টাচার্য্যের আবির্ভাব তিথি।

১০ই জ্যৈষ্ঠ, ২৪শে মে, সোমবার, একাদশীর ব্রত ও উপবাস।

১৯শে জ্যৈষ্ঠ, ২৩ জুন, বুধবার, শুক্লা চতুর্থী, শ্রীশ্রীকেশব কাশ্মীরী ভট্টের আবির্ভাব তিথি।

২১শে জ্যৈষ্ঠ, ৪ জুন, শুক্রবার, শুক্লা ষষ্ঠী প্রাতঃ ৪।২৮।৪৪ পর্য্যন্ত, পরে সপ্তমী রাত্রি ৩।৩৬।৩ পর্য্যন্ত। এই শুক্লা সপ্তমী শ্রীশ্রীস্বরূপাচার্য্যজীর আবির্ভাব তিথি।

২৪ জ্যৈষ্ঠ, ৭ই জুন, সোমবার, শুক্লা দশমী রাত্রি ১।৭।৪২ পর্য্যন্ত। দশহরা তিথি। গঙ্গাস্নান ও গঙ্গাপূজা কর্ত্তব্য। ব্রহ্মবিদেহী শ্রীমদ্ভক্ত শ্রী১০৮ স্বামী সত্যদাসজী মহারাজের আবির্ভাব তিথি। আজ শ্রীবৃন্দাবন শুকতলাতোড়স্থ 'কাঠিয়া বাবা কা স্থানের' মন্দির ও বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার দিন।

২৫শে জ্যৈষ্ঠ, ৮ই জুন, মঙ্গলবার, শুক্লা একাদশী। একাদশীর ব্রত ও উপবাস। নির্জ্জলা একাদশী।

২৯ জ্যৈষ্ঠ, ১২ জুন, শনিবার, জ্যৈষ্ঠী পূর্ণিমা ঘঃ ৯।৪০।২৮ পর্য্যন্ত। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা। গঙ্গাস্নান ও শ্রীশ্রীপুরুষোত্তমদর্শন কর্ত্তব্য।

সন ১৩৮৩, বাংলা আষাঢ় মাস ৩২দিন

৬ আষাঢ়, ২০ জুন, রবিবার, কৃষ্ণা অষ্টমী, শ্রীদয়াকর ভট্টাচার্য্যজীর আবির্ভাব তিথি।

৭ আষাঢ়, ২১শে জুন, সোমবার, কৃষ্ণা নবমী, শ্রীশ্রীরুক্ষ-ভট্টাচার্য্যজীর আবির্ভাব তিথি। রাত্রি ১০।৩৮।৪ গতে অমুবাচী প্রবৃত্তি। ৯ আষাঢ়, ২৩ জুন, বুধবার, একাদশীর ব্রত ও উপবাস।

১১ আষাঢ়, ২৪শে জুন, শুক্রবার, দিবা ঘঃ ১১।১।২৭ গতে অমুবাচী নিবৃত্তি।

১৪ আষাঢ়, ২৭ জুন, মঙ্গলবার, শুক্লা দ্বিতীয়া। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা।

২২ আষাঢ়, ৫ জুলাই, মঙ্গলবার, শুক্লা নবমী প্রাতঃ ঘঃ ৬।৩০।১২ পর্য্যন্ত, পরে দশমী। শ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা (স্মার্ত্তমতে)। শ্রীশ্রীমাধবাচার্য্যজীর আবির্ভাব তিথি।

২৪ আষাঢ়, ৮ জুলাই, বৃহস্পতিবার, বামনী। শয়নৈকাদশীর উপবাস। চাতুর্ম্মাস্য ব্রতারম্ভ।

২৭ আষাঢ়, ১১ই জুলাই, রবিবার, আষাঢ়ী পূর্ণিমা। গুরুপূর্ণিমা। অদ্য শ্রীশ্রীব্যাসদেবের পূজা ও স্বস্বগুরুপূজা করা কর্ত্তব্য। ব্রজধামে শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধনপরিক্রমা।

সাময়িকী

শুভ নববর্ষ :—বাংলা শুভ নববর্ষ ১৩৮৩ সালের প্রারম্ভে যে সকল শিক্ষার্থিনী ও ভক্তগণ শ্রীশ্রীগুরুদেবের নিকট প্রণাম জানাইয়া পত্র লিখিয়াছেন, সেই সকল পত্রের উত্তর প্রত্যেককে ব্যক্তিগতভাবে পত্রে আশীর্বাদ জানান সম্ভব নয় বলিয়া, তিনি এই পত্রিকা মাধ্যমে তাঁহাদের সকলকে এবং সকল শিক্ষার্থিনী ও ভক্তগণকে যথাযোগ্য কল্যাণ, আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা জানাইতেছেন।

শুভ নববর্ষের প্রারম্ভে আমরা আমাদের গ্রাহক গ্রাহিকা পাঠক পাঠিকা, লেখক লেখিকা, বিজ্ঞাপনদাতা, প্রেস ও অন্যান্য সকল শুভানুধ্যায়ীকে নববর্ষের অভিনন্দন জানাইতেছি ও শ্রীচরণে তাঁহাদের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ কামনা করিতেছি।

শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজ সংবাদ :—শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজ গত ১৫।৪।৭৬ তারিখে শিলচর হইতে ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। তিনি শিলং, তিনসুকিয়া ও নওগাঁও-এ কয়েকদিন করিয়া অবস্থান করিয়া ৩।৫।৭৬ তারিখে মালিগাঁও পৌঁছিবেন। তৎপর বাবাজী মহারাজ আরও কয়েকস্থানে অবস্থান করিয়া ২২।৬।৭৬ তারিখে কাঁঠিয়া বাবার আশ্রম, ডুমচরে আসিয়া পৌঁছিবেন। মালিগাঁও হইতে তাঁহার সম্পূর্ণ ভ্রমণসূচী পৃথকভাবে পরিবেশিত হইয়াছে - তাহা দ্রষ্টব্য।

দিল্লী সংবাদ

শ্রীপ্রবেশ নাথ ঘোষ জানাইয়াছেন যে, গত ১লা ফেব্রুয়ারী দিল্লীতে যে "শ্রীশ্রী ১০৮ স্বামী ধনঞ্জয়দাস কাঠিয়া বাবা সেবকসংঘ"—প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, সেই নূতন সংঘটিকে পরিচালিত করার জন্যে নিম্নলিখিত ভাবে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে—

শ্রীরাম ভজন সিংহ (সভাপতি), শ্রীরামনাথ শর্মা (সহঃ সভাপতি), শ্রীপ্রবেশ চক্রবর্তী (সম্পাদক), শ্রীঅজিত কুমার চক্রবর্তী ও শ্রীসুধীর রঞ্জন রায় চৌধুরী (যুগ্ম সম্পাদক), শ্রীঅচ্যুত কুমার বোস (কোষাধ্যক্ষ) এবং সভ্যগণ যথাক্রমে—শ্রীমতী গায়ত্রী মুখোপাধ্যায়, শ্রীমতী লীলা সেন, সর্বশ্রী প্রভাস কুমার মিত্র, দেবাশীষ বাগচী, শিবেন্দ্র চন্দ্র ভট্টাচার্য, বিদ্যুৎ কুমার দত্ত, প্রবেশ নাথ ঘোষ।

এই অনুষ্ঠানের শেষে বিশিষ্ট খোলবাদক শ্রীযুক্ত সাধুচরণ ঘোষের সহায়তায় সুন্দর ভজন ও কীর্তন পরিবেশন করেন স্থানীয় কীর্তনীয়া শ্রীযুক্তা স্নেহ মজুমদার এবং সর্বশেষে শ্রীমতী অর্চনা চক্রবর্তীর নেতৃত্বে শুরুবন্দনা 'ভবসাগর তারণ কারণ হে' গানটি সকলে মিলে গেয়ে সভার কাজ সেদিনের মত শেষ করা হয়। কীর্তনের সময় শ্রীশ্রী তুলসী বাবা উপস্থিত ছিলেন।

নবগঠিত সঙ্ঘের উদ্দেশ্যে শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজের আশীর্বাণী—

"দিল্লীতে তোমরা আমার নামে সংঘ করিয়াছ ইহা জানিয়া খুশী হইয়াছি। নির্বাচন যাহা করিয়াছ তাহা ভালই হইয়াছে। কীর্তন, গুরুবন্দনা ইত্যাদি হইয়াছে ভালই। তোমরা এইভাবে এই সংঘের কাজ ভালরূপে স্থায়ীভাবে করিলে তোমাদের খুবই কল্যাণ হইবে। সৎগ্রন্থ পাঠ, কথাকীর্তন ইত্যাদি সকলে একত্রে করিলে সকল বিধা ঘুচিয়া যাইবে, চিত্ত নির্মল হইতে থাকিবে, পূর্বাচার্যগণের আশীর্বাদ পাইবে। সম্প্রদায়ের প্রচার করার চেষ্টা করিবে। বইগুলির দ্বারা ঐ প্রচার হইবে।

কাশী মাতৃ আশ্রম হইতে শ্রীশ্রীসদাশিবমার আশীর্বাণী—

"তোমরা সকলে পবিত্র মনে সংঘবদ্ধ থাকিয়া সর্বদা সৎসঙ্গ, সচ্চিন্তা, সৎপ্রসঙ্গ, সজ্জনগণের পুণ্যজীবন আলোচনা, সৎগ্রন্থ পাঠ, সদ্বিচার, সৎবিষয়ের স্মরণ মনন ও সৎস্বরূপ ভগবানের নামাশ্রয়ে তোমরা আত্ম-কল্যাণের, আত্মসাক্ষাৎকারের পথে দ্রুত অগ্রসর হইয়া

মানবজীবন ধন্য কর—এই আমি সর্বান্তঃকরণে ইচ্ছা করি।"

বাসুদেব পত্রিকার আজীবন গ্রাহক

গত ২৪শে জানুয়ারী '৭৪, সুখচরস্থ "কাঠিয়া বাবার আশ্রম"এ শ্রীশ্রী১০৮ স্বামী ধনঞ্জয়দাসজী সেবকসংঘের এক বিশেষ অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে এককালে (একশত) টাকা চাঁদা দিয়া বাসুদেব পত্রিকার আজীবন গ্রাহক হইবার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে।

আজীবন গ্রাহকদের এককালে দেয় চাঁদা ১০০ টাকা বাসুদেবের কোষাধ্যক্ষ শ্রীপ্রবোধকুমার পাল মহাশয়ের নিকট "কাঠিয়া বাবার আশ্রম", পোষ্ট সুখচর, জিলা ২৪ পরগণা" এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। আজীবন গ্রাহকগণকে পত্রিকার জন্য বাৎসরিক চাঁদা আলাদা দিতে হইবে না এবং পত্রিকাও যথারীতি তাঁহাদের নিকট প্রেরিত হইবে। আমরা আমাদের সহৃদয় গুরুভ্রাতাভগিনী ও পাঠকবর্গকে আজীবন গ্রাহক হইবার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি।

TOUR PROGRAMME OF

Shri Shri 108 Swami Dhananjaydasjee Kathia Baba Maharaj.

Date	Transit/Haltage and address	Departure by Air/ Train/Taxi.	Remarks
7.5.76 to 9.5.76 (24th to 26th Baisakh).	Halt at Maligaon, C/O. Shrimati Minati Mazumder, 18A Nambari, Gauhati – 11.	By A.T. Mail on 10.5.76 Dep.—6.15 Hrs. Arr.—12.50 Hrs. at Alipurduar.	
	Halt at Alipurduar, C/O. Shri Asitlal Chakravorty, Officers Colony, Qrt. No. 34.	By 24 (Pass. Train) to Damdim Dep.—9.30 Hrs. Arr.—14.27 Hrs.	Ekadashi Brata on 10.5.76 (27th Baisakh).
	Halt at Damdim, C/O. Shri Sudip Choudhury, P.O. Damdim, Dist. Jalpaiguri.	Leave at 16.00 Hrs. on 15.5.76.	Lunar Eclipse on 13.5.76 (30th Baisakh)
	Halt at Damdim, C/O. Shri Kshetra Mohon Dhar, P.O. Damdim, Dist. Jalpaiguri.	By 24 (Pass. Train) to Siliguri Dep.—14.27 Hrs. Arr.—16.25 Hrs.	
17.5.76 to 20.5.76 (3rd Jaistha to 6th Jaistha).	Halt at Siliguri, C/O. Shri Sudhir Kumar Mukherjee, Michel Madhusudan Road.	Leave at 16.00 Hrs. on 20.5.76.	
20.5.76 to 22.5.76 (6th to 8th Jaistha).	Halt at Siliguri, C/O. Shri Haripada Chakrabarty, Hakimpara, Kanailal Dutta Rd.	Leave at 16.00 Hrs. on 22.5.76.	
	Halt at Siliguri, C/O. Dr. Sukumar Das Purkayastha, Dhananjay Nibas, Deshbandhu Para.	Leave at 16.00 Hrs. on 25.5.76.	Ekadashi Brata on 24.5.76 (10th Jaistha).
	Halt at Siliguri, C/O. Shri Birendra Nath Paul, New Market.	Leave at 16.00 Hrs. on 28.5.76.	
	Halt at Siliguri, C/O. Srimati Giribala Bhattacharjee, Subashpally.	Leave at 16.00 Hrs. on 31.5.76.	

Date	Transit/Haltage and address	Departure by Air/ Train/Taxi	Remarks
31.5.76 to 3.6.76 (17th to 20th Jaistha).	Halt at Siliguri, C/O. Shri Nirode Behari Dey, Arabinda Pally.	Leave at 16.00 Hrs. on 3.6.76.	
3.6.76 to 6.6.76 (20th to 23rd Jaistha).	Halt at Siliguri, C/O. Smti. Shila Das, Shila Bhavan, Hakimpara.	By Assam Mail to Katihar Dep.—7.15 Hrs. Arr.—12.50 Hrs. at Katihar.	
	Halt at Katihar, C/O. Sri Bijoy Kumar Roy Choudhury, 532A Saheb Para, P.O. Katihar Jn.	By Up Train to Forbeshganj. Dep.—13.55 Hrs. Arr.—16.40 Hrs	
14.6.76 to 17.6.76 (31st Jaistha to 3rd Ashar).	Halt at Forbeshganj, C/O. Shri Kalidas Biswas, P.O. Forbeshganj, Dist. Purnea.	By (Pass. Train) to Samastipur.	
17.6.76 to 21.6.76 (3rd Ashar to 7th Ashar),	Halt at Samastipur, C/O. Smti. Shefali Ghosh, H.P. Ghose & Sons.		
22.6.76 (8th Ashar).	Kathia Babar Asram, Sukhchar, 24 Parganas.		

The programme is subject to alteration in consideration of health of Shri Shri Babajee Maharaj.)

জীবনদর্পণ

গ্রন্থকার—শ্রীললিতকুমার বসু

মূল্য - চার টাকা

শ্রী১০৮ স্বামী ধনঞ্জয়দাসজী কাঠিয়া বাবা ও তাঁহার গুরুদেব শ্রী১০৮ স্বামী মধুদাসজী কাঠিয়া বাবার মধ্যে যে সকল পত্রের আদান-প্রদান হইয়াছিল এবং যেগুলি একত্রে পাঠ করিলে অপূর্ব গুরুশিষ্য-সংবাদ পাওয়া যায়, সেই সকল পত্রাবলম্বনে এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। ইহা শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজের সাধন-জীবনের একটি অকৃত্রিম প্রতিবিম্ব যাহা গুরুশিষ্যের পত্ররূপ দর্পণে প্রতিফলিত হইয়াছে। পরিশিষ্টে প্রদত্ত, পূর্বে গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত, শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজের কল্যাণকর উপদেশামৃত গ্রন্থের গুরুত্ব বৃদ্ধি করিয়াছে। এই গ্রন্থ সদ্‌গুরুর আশ্রিত সকল কল্যাণকামী সাধকের সাধনজীবনের পথপ্রদর্শক ও সহায়ক হইবে, সন্দেহ নাই।

কাঠিয়া বাবার আশ্রম সুবচনী হইতে প্রকাশিত গ্রন্থরাজি

ব্রজবিদেহী মহন্ত ও বৈষ্ণব চতুঃসম্প্রদায়ের শ্রীমহন্ত শ্রী১০৮ স্বামী ধনঞ্জয়দাসজী কাঠিয়া বাবা প্রণীত ও সম্পাদিত অধ্যাত্মসাধনার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ

শ্রীনিম্বার্কসম্প্রদায়ের আচার্যগণ ও তাঁহাদের উপদেশাবলী গ্রন্থমালার—

শ্রীশ্রীহংসভগবান্ ও তাঁহার উপদেশাবলী—প্রথম খণ্ড ২·৫০

শ্রীশ্রীসনকাদি চতুঃসন ও তাঁহাদের উপদেশাবলী—দ্বিতীয় খণ্ড ৫·০০

শ্রীশ্রীদেবর্ষি নারদ ও তাঁহার উপদেশাবলী (দুই ভাগে)—তৃতীয় খণ্ড পূর্ব ভাগ ৩·৫০ উত্তর ভাগ ৮·০০

শ্রীনিম্বার্কাচার্য, তাঁহার দার্শনিক মতবাদ ও সাধন প্রণালী (তিন ভাগে)—চতুর্থ খণ্ড

১ম ভাগ ৮·০০ ২য় ভাগ ৭·৫০ ৩য় ভাগ ৭·৫০

শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য ও তৎপরবর্তী আচার্যগণ (দুই ভাগে)—পঞ্চমখণ্ড পূর্বভাগ—১২·০০, উত্তরভাগ—৭·০০

শ্রীনিবাস-পদ্ধতি (তৃতীয় সংস্করণ) ২·৫০

বেদান্তকামধেনুঃ (দশশ্লোকী)—তত্ত্বদীপিকা নামক টীকাসহ ৭·৫০

নিম্বার্ক বেদান্ত কা সংক্ষিপ্ত সার (হিন্দী) (উত্তর প্রদেশ সরকার কর্তৃক পুরস্কৃত) ৮·০০

সঙ্কল্পতত্ত্বদীপ ২·৫০

ব্রজবিদেহী মহন্ত তথা চতুঃসম্প্রদায়ের শ্রীমহন্ত শ্রী১০৮ শ্রীরামদাস কাঠিয়া বাবাজী মহারাজ জীবনচরিত (হিন্দী)—(শ্রীমতী পার্বতী সান্যাল কর্তৃক প্রকাশিত) ৪·০০

ব্রজবিদেহী মহন্ত শ্রী১০৮ স্বামী সন্তদাস মহারাজের জীবনী ১ম খণ্ড ও ২য় খণ্ড একত্রে ৪·০০ ৩য় খণ্ড ৪·০০০

পত্রাবলী :—ব্রজবিদেহী মহন্ত ও চতুঃসম্প্রদায়ের শ্রীমহন্ত শ্রী১০৮ স্বামী সন্তদাসজী কাঠিয়া বাবা মহারাজ কর্তৃক লিখিত (৩ খণ্ডে সম্পূর্ণ) ১ম খণ্ড ৩·৫০ ২য় খণ্ড ৩·৫০ ৩য় খণ্ড ৩·০০

শ্রীকেশবকাশ্মীরিভট্টজী মহারাজ— ১·৫০

১৩। শ্রীবৃন্দাবনমাহাত্ম্য ও ব্রজপরিক্রমা— ২·৫০

১৪। অষ্টযামসেবাতত্ত্ব ২·৫০

১৫। শরণাগতবৎসল শ্রীভগবান্ ১·৫০

১৬। ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবনে বৈজ্ঞানিক নিয়মের প্রয়োজনীয়তা ০·৬২

১৮। গুরুপূর্ণিমা ০·৫০

১৯ শ্রীশ্রীধনঞ্জয়দাস উপদেশামৃত—(সঙ্কলক ও প্রকাশক শ্রীললিতকুমার বসু ৫·০০

২০। শ্রীশ্রীধনঞ্জয়দাস পত্রামৃত—(সঙ্কলক ও প্রকাশক শ্রীললিতকুমার বসু) ৪·০০

আরও যে সকল গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে :—

১। চিত্রাবলী (ব্রজবিদেহী মহন্ত ও চতুঃসম্প্রদায়ের শ্রীমহন্ত শ্রী১০৮ স্বামী ধনঞ্জয়দাসজী কাঠিয়া বাবার সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য ও তাঁহার বাণীসহ প্রায় দুইশত চিত্রে এ্যালবাম (সঙ্কলক ও প্রকাশক শ্রীললিতকুমার বসু)

২। শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজের জীবনদর্শন—শ্রীললিতকুমার বসু

ডঃ অমরপ্রসাদ ভট্টাচার্য, এম. এ, পি-এইচ. ডি, বেদান্তশাস্ত্রী, কাব্য-বেদান্ত-বেদান্ত-তীর্থ কর্তৃক প্রণীত

১ ব্রজবিদেহী মহন্ত ও চতুঃসম্প্রদায়ের শ্রীমহন্ত শ্রী১০৮স্বামী ধনঞ্জয়দাস কাঠিয়া বাবাজী মহারাজের জীবন-চরিত প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড একত্রে বোর্ডে বাঁধাই—৬·০০ প্লাষ্টিক কভারসহ ৮·০০

২। শ্রীনিম্বার্ক ও বৈজ্ঞানিক দর্শন— ১৯·৫০

৩। দময়ন্তী পঞ্চক বা ভগবান কৃষ্ণের আবির্ভাবকাল ইত্যাদি বিষয়ক মতবাদের সমালোচনা ও বিচার— ৪·০০

৪। উপনিষৎ প্রসঙ্গ— ২·৫০

যুগভূমিকায় স্বামী সন্তদাস—শ্রীরাধারমন চৌধুরী ৪·০০

স্বামী সন্তদাস নিম্বার্কদর্শন সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত :—

১। স্বামী সন্তদাস জীবনালেখ্য—শ্রীবিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এম, এ

২। Guru Purnima (In English)—Translated by Sri Susil Kumar Roy.

৩। সপ্তর্ষি সন্তদাস ও তাঁহার অমৃতবাণী—শ্রীদেবীপ্রসাদ ভট্টাচার্য এম. এ

উপরোক্ত গ্রন্থ ভিন্ন স্বামী সন্তদাস নিম্বার্কদর্শন সমিতির মুখপত্র "বাঙ্ময়ের" পত্রিকাও বাহির হইতেছে, তাহা সদস্যগণ বিনা পয়সায় পাইয়া থাকেন—বার্ষিক মূল্য ৮·০০ (টাকা)।

মাতৃ আশ্রম কাশী হইতে প্রকাশিত :—

১। শ্রীশ্রীমা অমদা দেবী—

শ্রীমদ্ভাগবতী, পরমার্থ, বেদান্তদর্শনকথা—৪·০০

প্রাপ্তিস্থান :—(১) কাঠিয়া বাবার আশ্রম, পোঃ সুবচনী, ২৪ পরগণা। (২) মহেশ লাইব্রেরী, ২।১ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০১২

শ্রীপ্রফুল্লকুমার চক্রবর্তী কর্তৃক ১৯: বেলেঘাটা চিত্তরঞ্জন রোড বড়বাজার (২৪ পরগণা) হইতে প্রকাশিত এবং ওশিয়ান প্রিন্টার্স লিঃ-১২, ডি, আই, টি, রোড কলিকাতা-১৪ হইতে মুদ্রিত।